অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ও লৌকিক রহস্য সন্দর্ভ।

"কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং।"

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in our philosophy"

SHAKESPEARE

প্রথম খণ্ড। ১

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক
কলিকাতা,—শোভাবাজার,—গ্রে ষ্ট্রীট ১০২ নং ভবনস্থ
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
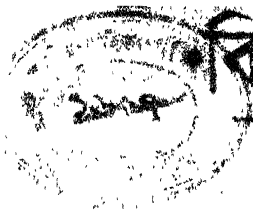
সম্বৎ ১৯৩৪।

বিশ্ব-রহস্য।

অর্থাৎ

অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ও লৌকিক

রহস্য সন্দর্ভ।

"কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং !"

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

SHAKESPEARE.

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

কলিকাতা,—শোভাবাজার,—গ্রে ষ্ট্রীট ১৬২ নং ভবনস্থ

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৩৪।

PRINTED BY
S. P. CHATTERJEE, AT THE NEW BENGAL PRESS,
102, GREY STREET;
CALCUTTA.

মুখবন্ধ।

কতিপয় নৈসর্গিক ও শিল্পসম্বন্ধীয় রহস্যের বিবরণ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি প্রচারিত হইল। ঐ সকল বিবরণ আমরা কয়েকখানি ইংরাজি গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়াছি মাত্র ;—বিষয়গুলি নির্ব্বাচন করিয়া ভাষান্তর করিতে যে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ও পরিশ্রম পরিচালনার আবশ্যক, আমাদিগকে তদতিরিক্ত আর কিছুই করিতে হয় নাই।

যাহাতে সকল শ্রেণীর পাঠকের সন্তোষবিধান হইতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আমরা যত্নের ত্রুটি করি নাই; কিন্তু সে যত্ন সার্থক হইবে কি না, এক্ষণে বলিতে পারি না। যাঁহারা কেবল অবকাশকাল হরণের মানসে নাটক, নবন্যাস প্রভৃতি পুস্তকই পাঠ করেন, বিশ্ব-রহস্য পাঠের দ্বারা তাঁহাদিগের সে অভীষ্ট সিদ্ধ, অথচ কিঞ্চিৎ আনুষঙ্গিক উপকারও লাভ হইতে পারিবে। যেহেতু নবন্যাসাদি গ্রন্থের ন্যায় বিশ্ব-রহস্যও সুখপাঠ্য, ইহাতে কোন দুরূহ জটিল বিষয়ের আলোচনা নাই, অথচ বিশ্ব-রহস্য মায়াময়ী মিথ্যা রচনাও নহে,—ইহার আদ্যোপান্ত সমস্তই

সত্যের উপকরণে পরিপূর্ণ, অধিকন্তু সে সকল সত্য কবির কল্পনা অপেক্ষাও অধিকতর মনোহর। এতদ্ভিন্ন, অজ্ঞাত বিষয় সমস্ত জানিবার নিমিত্ত যে সকল পাঠকের বুভুক্ষা আছে, বিশ্ব-রহস্যে তাঁহারাও রুচির উপযোগী প্রচুর আহার-সামগ্রী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ মনুষ্যের জ্ঞানবৃক্ষের মূল কৌতূহলবৃত্তি;—বিশ্ব-রহস্য সেই জ্ঞান-বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চনের উদ্দেশেই প্রচারিত হইল; সুতরাং জ্ঞানার্থিগণও যে ইহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

এই পুস্তক প্রণয়নসময়ে, আমাদিগের বান্ধববর্গের মধ্যে কেহ কেহ দুই একটি রহস্যের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অমূলক কল্পনা বলিয়া তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ নির্ঝরবৃক্ষনামে যে বৃক্ষের বৃত্তান্ত এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে, তাহার অস্তিত্বে সে সময়ে তাঁহারা কেহই বিশ্বাস করেন নাই; পরে গত ৮ই সেপ্টেম্বরের ইংলিসম্যান পত্রে ঐ বৃক্ষের বিবরণ পাঠ করিয়া এক্ষণে তাঁহাদিগের অবিশ্বাস অপনীত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষসম্বন্ধে ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন :—

"Now that seasons of drought are becoming of such constant recurrence in this country, it would be as well if the superintendents of our "Botanical-Gardens would turn

their attention to a tree, said to have been lately discovered in the forests near the town of Moyobamba, in Peru, called by the Indians "Tamia-Caspi" or "Raintree" which possesses remarkable properties.—This wonderful vegetable production, we are told, absorbs the moisture of the atmosphere, which it concentrates, and subsequently pours forth from its leaves and branches in a perfect shower, and in such quantity that in many cases, the surrounding soil is converted into a bog. We are further informed that it possesses this singular power to a greater degree during the hot, dry weather, when the rivers are at their lowest, and the water most scarce. It has been suggested to the Peruvian government, by a gentleman who has examined these trees, that the experiment of their culture in the more arid parts of that country should be made with a view to the benefit of agriculturists."—*Englishman, 8th September*, 1877.

"এদেশে এক্ষণে পুনঃ পুনঃ অনাবৃষ্টি ঘটনা হইতেছে, অতএব পেরু-রাজ্যের ময়োবাম্বা নগরের নিকটবর্ত্তী কাননে সম্প্রতি যে একজাতি বৃক্ষের আবিষ্কার হইয়াছে, এ সময়ে আমাদিগের উদ্ভিদ্-উদ্যানসমূহের তত্ত্বাবধারকেরা ঐ বৃক্ষের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। আমেরিকার আদিম নিবাসিগণের ভাষায় ঐ বৃক্ষের নাম "তামিয়া-কাম্পি" অর্থাৎ "বৃষ্টিবৃক্ষ"। তামিয়া-কাম্পির একটি অসাধারণ গুণ আছে।—আমরা শ্রুত হইলাম যে, এই আশ্চর্য্য উদ্ভিজ্জ, আকাশ-মণ্ডলের জলীয়ভাগ আকর্ষণ করিয়া অগ্রে আপনার শরীরস্থ করে, পরে ঐ সলিল-সঞ্চয় শাখাপত্রদ্বারা প্রকৃত বারিধারার ন্যায় ঈদৃশ প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করে যে, অনেক স্থলে বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থলভাগ জলাভূমি হইয়া পড়ে। আমরা আরও অবগত হইয়াছি যে, যখন নদ-নদী প্রভৃতি জলাশয় সমস্ত শুকাইয়া যায় এবং অতিশয় জলকষ্ট উপস্থিত হয়, এরূপ উত্তপ্ত নিদাঘ ঋতুতে ঐ বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ণিত অদ্ভুত শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়। একজন ভদ্রলোক ঐ

বৃক্ষের অন্বেষণানুসন্ধান করিয়া দেখিয়া পেরুদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ঐ দেশের যে যে প্রদেশে জলের অনাটন আছে, সেই সেই প্রদেশে ঐ বৃক্ষ রোপণ করিলে তদ্দ্বারা কৃষিকার্য্যের মঙ্গল হয় কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।"

ইংলিসম্যানের বৃষ্টিবৃক্ষের এই বর্ণনা, বিশ্ব-রহস্যের নির্ঝরবৃক্ষের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, বৃষ্টিবৃক্ষ ও নির্ঝরবৃক্ষ, উভয়ই একজাতীয়।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন কোন বিষয়ে প্রগাঢ় প্রত্যয় উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা সত্য, কিন্তু—"কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"—কালের অবধি নাই, পৃথিবীও বিপুলা, সুতরাং সকল কালের ও সকল দেশের সমুদয় বিষয় এক ব্যক্তির প্রত্যক্ষগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। অগত্যা যুক্তি ও অনুভব অবলম্বনে, বিনা প্রত্যক্ষেও অনেক বিষয়ে বিশ্বাস করিতে হয়;—নচেৎ নরজাতির জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত হইতে পায় না। অতএব অপ্রত্যক্ষ কোন বিষয়ের বিবরণ জ্ঞাতসার হইলে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্ত্তী যে ভাব, জ্ঞানার্থিগণের তাহাই অবলম্বন করা উচিত; যেহেতু নির্ব্বূঢ় বিশ্বাস ও নির্ব্বূঢ় অবিশ্বাস, এতদুভয়ই অনুসন্ধান-বৃত্তিকে রোধ করিয়া জ্ঞানোন্নতির বিঘ্ন-সাধন করে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এস্থলে ব্যক্ত করিতেছি যে, একদা জনৈক ইংরাজপুরুষ ব্রহ্মরাজ্যের রাজসভায়

কহিয়াছিলেন যে, শীতকালে ইউরোপখণ্ডের কোন কোন নদীর জল এরূপ কঠিন হয় যে, তাহার উপর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে শকটাদি গতায়াত করিতে পারে। প্রত্যক্ষাতীত বিষয় বলিয়া সভার কোন ব্যক্তিই তাঁহার এই বাক্যে বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু সত্যাসত্য নির্বাচন করিবার ক্ষমতা-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত থাকিলে বোধ হয়, তিনি এইরূপে যুক্তি পরিচালনা করিতেন যে, যদিও নদীর জল জমিয়া যাইতে কখন দেখা যায় নাই, কিন্তু শীতকালে তরল ঘৃত গাঢ় হইতে দেখা গিয়াছে;—এতদবস্থায় দেশবিশেষে অপেক্ষাকৃত অধিক শীতের প্রভাবে নদীর জল কথিতানুরূপ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইলেও হইতে পারে। মঙ্গো পার্ক নামক একজন ইংরাজ আফ্রিকাখণ্ডে পর্য্যটন করিবার সময়ে তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণকে কহিয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের লোকেরা হস্তীকে বশীভূত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করে এবং তাহাকে ভার বহন করায়। এই কথা শুনিয়া কাফ্রিরা হাসিয়া কহিয়াছিল, "এটি গোরা লোকের মিথ্যা কথা"। আফ্রিকাখণ্ডে অনেক হস্তী আছে, কিন্তু তথাকার লোকেরা হস্তীকে বশীভূত করিতে জানে না; সুতরাং যাহা কখন প্রত্যক্ষ করে নাই, এরূপ বিষয়ে তাহাদিগের কিছুতেই প্রত্যয়

হইল না। ব্রহ্মরাজ্যের সভাসদ্বর্গ ও আফ্রিকার কাফ্রিগণের এই বিবরণ আমরা যে উদ্দেশে এস্থলে বিবৃত করিলাম, সুচতুর পাঠকগণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন;—বিশ্ব-রহস্যে যে সকল বিষয় বিবৃত হইল, তৎসংক্রান্ত সত্যাসত্যের মীমাংসা করিবার সময়ে, ভরসা করি, তাঁহারা সে উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইবেন না।

প্রাণিবিদ্যা, শিল্পশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ইতিবৃত্ত ইত্যাদি বহুল শাস্ত্র হইতে আমরা অনেকানেক বোধাতীত রহস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি;—তন্মধ্যে কতিপয় বিষয় এই প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইল। পাঠকগণের রুচির গতি বুঝিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট রহস্যগুলি সংখ্যানুক্রমে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিব, এরূপ ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে সাধারণ সমীপে প্রার্থনা যে, বিশ্ব-রহস্যে প্রকাশের যোগ্য কোন রহস্য কাহারও জ্ঞাতসার থাকিলে, তিনি কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা সে সকল বিষয় প্রেরকের নামসম্বলিত সাদরে বিশ্ব-রহস্যের পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

রহস্য-প্রিয়স্য।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়।
কলিকাতা,—শোভাবাজার ষ্ট্রেট ষ্ট্রীট নং ১০২।
১লা কার্ত্তিক,—সম্বৎ ১৯৩৪।
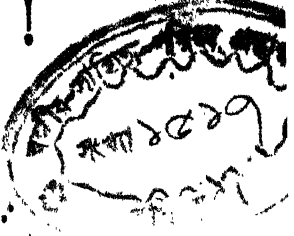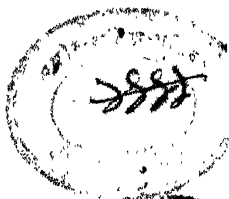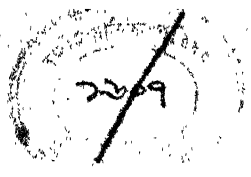
সূচীপত্র।

বিশ্ব-রহস্য।

প্রাকৃতিক পদার্থে শিল্প-সাদৃশ্য।

স্বভাবের অনুকৃতির নাম শিল্প। মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীকে শিল্প-বিষয়ে সুনিপুণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঊর্ণনাভ যে সুচিক্কণ জাল প্রস্তুত করে, তাহাকে শিল্প কার্য্য বলা যায় না, সে তাহার স্বভাবের কার্য্য। অন্যের উদাহরণ দেখিয়া ঊর্ণনাভ জাল প্রস্তুত করে না;—আহার, অঙ্গচালনা ইত্যাদি কার্য্যের ন্যায় জালরচনাও তাহার সহজাত ধর্ম্ম,—জালরচনা তাহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। ঈদৃশ প্রাকৃতিক উত্তেজনা হইতে যে কার্য্য প্রভবিত হয়, তাহাকে শিল্প বলা যাইতে পারে না; প্রত্যুত তাহা শিল্পের বিপরীত;—তাহারি নাম স্বভাব। স্বভাবের কার্য্য নিরপেক্ষ, তাহার আর আদর্শের আবশ্যক হয় না; কিন্তু আদর্শের অবলম্বন ভিন্ন শিল্পকার্য্য সম্ভূত হইতে পারে না। স্বভাব, ইচ্ছার নিয়ন্তা;—শিল্প, ইচ্ছার দাস। অনেক বিষয়ে স্বভাব ও শিল্পের পরস্পর এইরূপ বিপরীত ভাব প্রতীয়মান হয়, অথচ সেই স্বভাবই শিল্পের উৎপত্তির স্থান। নিপুণবুদ্ধি নরজাতি হইতে যত প্রকার শিল্প সমুদ্ভূত হইয়াছে, সকলি স্বভাবের অনুকরণ মাত্র; অল্প বিবেচনা করিয়া দেখিলেই

এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে, সুতরাং এস্থলে তাহার সবিস্তার প্রমাণ সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই।

যদি স্বভাবের অনুকৃতির নামই শিল্প হইল, তবে স্বভাব শিল্পের যে অনুকরণ করেন, তাহাকে কি বলা যাইবে? বোধ হয়, প্রকৃতির সে লীলার নাম কোন ভাষাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, ও বুঝিতে পারা যায়, সকল ভাষাতে তাহারি নাম পরিকল্পিত হইয়াছে; কিন্তু স্বভাবের শিল্পচাতুরী সাধারণের দৃষ্টির ও বুদ্ধির অতীত বিষয়, সুতরাং তাহার নাম কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? মনুষ্য বহুকষ্টে স্বভাবের অনুকরণ করিয়া আপনাকে বুদ্ধিমান ভাবিয়া হর্ষিত ও গর্ব্বিত হয়েন, কিন্তু চতুরা প্রকৃতি তাঁহার সে গর্ব্ব ভঞ্জন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। বিনা যত্নে বিনা আয়াসে প্রকৃতি যে সকল কারুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে অতি সুনিপুণ শিল্পিগণকে এককালে অবসন্ন ও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। স্বভাবের শিল্প-সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিবরণ আমরা নিম্নে প্রকটিত করিলাম. পাঠ করিলে আমাদিগের উক্তির মর্ম্ম অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

পূর্ব্বকালে গ্রীস ও রোম রাজ্যের লোকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় অনেক দেবদেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন। ঐ উভয় জাতির দেবদেবীগণের নাম ও আকারগত অনেক সাদৃশ্য ছিল। তাঁহাদিগের দেববর্গের মধ্যে এক দেবতার নাম আপলো। ঐ দেবপুরুষ পরম রূপবান্, কাব্য ও সঙ্গীতের একান্ত অনুরাগী, নয়টি লাবণ্যময়ী দেবললনা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন, তিনি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া হার্প নামক বীণা বাদন করিতেছেন, এইরূপ প্রতিমা ও পট প্রস্তুত করিয়া গ্রীক্ ও রোমকেরা আপলো দেবের অর্চ্চনা করিতেন।

রোমক পণ্ডিত প্লিনি লিখিয়াছেন, মিউজ্ নামধারিণী ঐ নয়টি দেবী-পরিবেষ্টিত আপলো দেবের পূর্ব্ববর্ণিতরূপ অবিকল প্রতিমা, একখণ্ড পাষাণে অতি সুচারুরূপে চিত্রিত ছিল; ঐ চিত্র কোন মনুষ্যকৃত নহে, স্বয়ং প্রকৃতিই তাহার শিল্পী। প্লিনির বর্ণিত ঐ প্রস্তরপট এক্ষণে কোথায় আছে, অথবা কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। বিনিস নগরের একখানি প্রস্তরে, সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন একটি নরমূর্ত্তি স্বতঃসিদ্ধ চিত্রিত থাকার বিবরণ শ্রুত হওয়া যায়। পিসা নগরে সেণ্ট জন নামক গির্জায় একখানি প্রস্তর আছে, তাহাতে একখণ্ড মরুভূমি, ঐ মরুর মধ্যে একটি নদীপ্রবাহ, এবং তাহার তটে জনৈক বৃদ্ধ-পুরুষ ঘণ্টা হস্তে লইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এইরূপ স্বভাব-নিষ্পন্ন বিচিত্র চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয়ানেরা সেণ্ট আণ্টনি নামক সিদ্ধ পুরুষের যেরূপ পট চিত্রিত করেন, পিসা নগরের ঐ চিত্রের সহিত তাহার বিশেষ সাদৃশ্য অনুভূত হয়। কুস্তুনতুনিয়া নগরে সেণ্ট সোফিয়া নামক গির্জায় একখণ্ড শ্বেতবর্ণ মার্বল পাথরে সেণ্ট জন নামক খৃষ্টীয়ান ঋষির মূর্ত্তি অতি সুচারুরূপে চিত্রিত ছিল, দেখিলে বোধ হইত যেন, তাঁহার কলেবর উষ্ট্রের চর্ম্মে আবৃত রহিয়াছে। স্বভাব-নিষ্পন্ন ঐ চিত্রে কেবল একখানি চরণের অভাব ছিল মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হইত না। ইটালি রাজ্যে একখানি পাষাণ সংগৃহীত হয়, তাহাতে ক্রুশ যন্ত্রে যীশু খৃষ্টের অন্তিমকালীন মূর্ত্তি এরূপ সুনিষ্পন্নভাবে চিত্রিত ছিল যে, দেখিলে সহসা বোধ হইত, কোন উত্তম চিত্রকর অতি যত্নের সহিত উহা চিত্র করিয়া রাখিয়াছে। ক্রুশ-যন্ত্রলগ্ন লৌহ-কীলকগুলি, খৃষ্টের কলেবরের ক্ষত স্থান সমুদয়, ও বিন্দু বিন্দু রক্তপাত, এ সমস্তই ঐ চিত্রফলকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইত। জর্ম্মণির একটি

খনিতে একখণ্ড ধাতুর উপরে এক জন মনুষ্য ও তাহার স্কন্ধে একটি বালক চিত্রিত দৃষ্ট হইয়াছিল, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। রোমের সুপ্রসিদ্ধ গির্জায় একখানি মারবল প্রস্তরে জনৈক খৃষ্টীয়ান যাজকের প্রতিরূপ অঙ্কিত ছিল। ঐ চিত্র কৃত্রিম কি না, তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত গির্জার অধ্যক্ষ পোপ ঐ পাষাণপট ঘর্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃত্রিমের ভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় নাই। প্রবেন্স প্রদেশের খনিতে স্বভাব-ভাস্কর-কর-গঠিত বিবিধ পশু পক্ষী ও বৃক্ষাদির ধাতুময়ী মূর্ত্তি দৃষ্ট হওয়ার প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাতার দেশের পশ্চিমভাগস্থ পর্ব্বতে অশ্ব, উষ্ট্র ও মেষ প্রভৃতির স্বভাব-নিষ্পন্ন পাষাণ-মূর্ত্তি কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের চিত্রশালিকায় একখানি পাষাণফলকে চসর নামক প্রাচীন ইংরাজ কবির অবিকল প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে;—ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সাধারণতঃ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির অবয়ব স্বভাবতঃ চিত্রিত হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে আবার কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিরূপ প্রকটিত দেখিলে কাহার বুদ্ধি না অবসন্ন হয়?

কোন কোন উদ্ভিজ্জেও এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড দেশের কেণ্ট, লিন্‌কলন প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে এক প্রকার ফুল জন্মে, ঐ ফুলের হৃদয়ে একটি মধুমক্ষিকা উপবিষ্ট থাকিয়া মধু পান করিতেছে, এইরূপ দৃষ্ট হয়। স্বরূপতঃ উহা মধুমক্ষিকা নহে;—প্রকৃতি-চিত্রিত মধুমক্ষিকার প্রতিরূপ মাত্র। কিন্তু ঐ প্রতিরূপ এরূপ অভিন্ন যে, অতি অল্প অন্তরে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিলেও তাহাকে জীবন্ত মধুমক্ষিকা বলিয়া ভ্রম জন্মে। ঐ ফুলের ইংরাজী নাম অর্‌চিস, সামান্যতঃ তাহাকে (Bee-flower) বী-ফ্লাওয়ার অর্থাৎ মধুমক্ষীপুষ্প

বলিয়া থাকে। ল্যাংহরণ নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি ঐ ফুল লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন ;—*

"হের ওই সুখ-স্পর্শ ফুলের উপরে
চঞ্চল মক্ষিকা বসে নিপুণ কেমন!
চিকণ তরল পাখা, লোম কলেবরে,
জঘনেতে† ভরা মধু, কাঞ্চনবরণ।
উড়িতে না পারিতেছে মধু ভার নিয়া,
এই ভেবে উড়াইয়া দিতে হলো চিত ;
কি আশ্চর্য্য! হেরিলাম উড়াইতে গিয়া,
জীবন্ত মক্ষিকা নয় মক্ষিকা চিত্রিত॥"

ঐ ফুলের আর এক জাতি আছে, তাহার হৃদয়ে মধুমক্ষিকার পরিবর্ত্তে সাধারণ মক্ষিকার প্রতিরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে।

---

* "See on that flowret's velvet breast,
How close the busy vagrant lies!
"His thin wrought plume, his downy breast,
The ambrosial gold that swells his thighs.

"Perhaps his fragrant load may bind
His limbs;—we'll set the captive free—
"I sought the living bee to find,
And found the picture of a bee."

† মধুমক্ষিকার জঘন দেশে এক একটি ক্ষুদ্র গহ্বর আছে ; মধুমক্ষিকা কুসুম হইতে মধু আহরণ করিয়া প্রথমতঃ সেই গহ্বরে সঞ্চিত করে, পরে মধুচক্রে লইয়া যায়।

মাণ্ড্রেক নামে আর এক প্রকার উদ্ভিদ আছে; ঐ উদ্ভিদ পত্রশূন্য হইলে, তাহার অবয়ব অবিকল নরশরীরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। জিন সেঙ্ নামে আর এক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে, তাহার অবয়বও মনুষ্যের ন্যায়। পূর্ব্বোক্ত ল্যাংহরণ কবি মাণ্ডেকের বিষয়ে লিখিয়াছেন;—*

"দেখ দেখি শিফা-যুক্ত ম্যাণ্ড্রেক্ কেমন
নর-সম কর পদ দেখায় লীলায়!
সুগঠিত দেহ তার ক'রে বিলোকন
স্তম্ভিত কৃষক ডরে থমকি দাঁড়ায়॥†"

---

* "Mark how that rooted Mandrake wears
His human feet, his human hands;
"Oft, as his shapely form he rears,
Aghast the frighted ploughman stands."

† দেশীয় কোন বিচক্ষণ বৈদ্যের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, লক্ষ্মণামূল নামে এক প্রকার মূল আছে, আমাদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন কোন ঔষধে তাহা ব্যবহার করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। ঐ মূল এ দেশে জন্মায় না। বৈদ্যদিগের ব্যবহারার্থে বিদেশ হইতে আনিয়া বণিকেরা পূর্ব্বে তাহা বিক্রয় করিত। কিন্তু এক্ষণে বণিগ্‌গণের বীথিকায় আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ লক্ষ্মণামূল অবিকল নরাকার, আরো আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ মূল স্ত্রী ও পুরুষ উভয়জাতীয় হয়, এবং তাহার অঙ্গের যথাস্থানে জাতি সূচক চিহ্নও থাকে। ডাক্তার হনিংবার্জর, যিনি কিছুকাল কলিকাতায় ছিলেন, তিনি কাশ্মীর ও হিমালয় খণ্ডের অনেক উদ্ভিজ্জের গুণ পরীক্ষা করিয়া, তাহাদিগের লাটিন, ইংরাজি, ফারসি, আরবি ও দেশীয় নাম সম্বলিত এক তালিকা প্রচার করেন, তাহাতে ম্যাণ্ড্রেকের দেশীয় নাম লক্ষ্মণা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যের উক্তির পোষকতা হয়। কিন্তু ম্যাণ্ড্রেকের বিষয়ে উপরে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রী পুরুষ-জাতিপ্রভেদের কোন উল্লেখ নাই, বিশেষতঃ, তাহার সমগ্র শরীরই নরের ন্যায় অথবা কেবল মূলভাগ তদাকারের, মূল প্রস্তাবে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। কেবল এইমাত্র লিখিত আছে, পত্র হীন অবস্থায় ঐ উদ্ভিজ্জকে নরের ন্যায় দেখায়,

প্রোক্ত কবিবর স্বরচিত কাব্যের উপসংহারে লিখিয়াছেন ;—*

"হেল্‌ভিসিয়া-গিরি'পরে, সাব্রিণা সাগরে
উজ্জ্বল উপল কত রয়েছে এমন
প্রকৃতি, খোদিত যায় করি নিজ করে
সুচারু মূরতি-চয়, রেখেছে গোপন ॥"

---

* "Helvetia's rocks, Sabrina's waves,
Still many a shining pebble bear :
"Where nature's studious hand engraves
The perfect form and leaves it there."

ইহাতে বোধ হয় যে, শাখা প্রশাখা সম্বলিত তাহার সমগ্র শরীরই নরশরীরের ন্যায় লক্ষিত হয় ; কিন্তু ল্যাংহরণ কবি ঐ উদ্ভিজ্জের মূলভাগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া লিখিয়াছেন " দেখ দেখি শিফাযুক্ত ম্যাণ্ড্রেক কেমন " ইহাতে অনুমিত হয় যে, কেবল মূলভাগেই নরাকৃতির সাদৃশ্য আছে। যাহাই হউক, লক্ষ্মণামূল আমাদিগের ঔষধ ব্যবহার্য্য বস্তু, অথচ এখানকার কোন বণিকের দোকানেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেশীয় সকল বিষয়ই ক্রমে ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। ঋদ্ধি বৃদ্ধি মেদ মহামেদ প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের নাম সংস্কৃত চিকিৎসা-গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সুতরাং কোন সময়ে অবশ্যই তাহাদিগের ব্যবহার ছিল, বলিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণে কোন বৈদ্য বা বণিক্ ঐ সকল ঔষধের সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন না। আধুনিক বৈদ্যেরা অগত্যা তাহাদিগের প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, যথা " মেদাভাবে চাশ্বগন্ধা মহামেদে চ সারিবা " মেদ অভাবে অশ্বগন্ধা এবং মহামেদ অভাবে অনন্তমূল। " মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ " যেরূপ, ইহাও সেইরূপ। এক দ্রব্যের অবিকল গুণ অন্য দ্রব্যে সম্ভাবিত হয় না।

মৎস্যনারী ও মৎস্যনর।

"নির্ব্বোধেরা যাহা শুনে তাহাই বিশ্বাস করে,—সম্ভব অসম্ভবের প্রতি কিছু মাত্র বিবেচনা করে না," অনেক বিবেচক ব্যক্তি সময়ে সময়ে এইরূপ কহিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি, মনুষ্যের দোষ নাই;—এই জগত্ই মনুষ্যকে নির্ব্বোধ করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্য কি করিবে? চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ এড়াইতে পারে না। যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহা অসম্ভব হইলেও অলীক বলিতে পারে না। এইরূপে দেখিতে শুনিতে অবিশ্বাসের গ্রন্থি সকল একে একে খুলিয়া যায়, তখন তাহার নিকট আর কিছুই অসম্ভব বোধ হয় না। তখন সে অকপটে স্বীকার করে, "হে জগদীশ্বর! তোমার আশ্চর্য্য রচনার শক্তি অসীম; মনুষ্যের ক্ষুদ্র চিত্তের বিশ্বাস, যখন সে সকল আশ্চর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না, তখন মনুষ্যের বুদ্ধি তাহাতে কি রূপে প্রবিষ্ট হইবে?" আমরা নিম্নে যে আশ্চর্য্য জীবের বিবরণ প্রকটিত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া অনেক বুদ্ধিমান্ পাঠকের হৃদয়ে ঐ ভাব জাগরূক হইতে পারে;—"হে জগদীশ্বর! তোমার আশ্চর্য্য রচনার শক্তি অসীম।"

ওলন্দাজদিগের দেশের ভূমি অতি নিম্ন; তন্নিমিত্ত জলপ্লাবন নিবারণার্থে তথাকার সাগরকূলে অতি দৃঢ় মৃত্তিকার প্রাচীর-শ্রেণী বিনির্ম্মিত আছে। ইংরাজি ১৪৩০ অব্দে ঐ দেশে একটি প্রবল ঝটিকা হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীরমালার কিয়দংশ স্খলিত হওয়ায় নিকটবর্ত্তী ভূমিভাগ সমুদ্রজলে আপ্লাবিত হইয়াছিল। এক দিবস কতিপয় স্ত্রীলোক নৌকারোহণে ঐ প্লাবিত স্থান পার হইবার সময়ে সহসা জলোপরিভাগে একটি মনুষ্যের মস্তক দেখিতে পাইল। তাহারা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিকটে যাইয়া দেখিল, একটি সুন্দরী নারী ঐ অনতি গভীর নীরে

দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। নাভির উপরিভাগ হইতে ঐ নারীর সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানবীর ন্যায়, কিন্তু নাভির অধোভাগে চরণের পরিবর্ত্তে মৎস্যের আকার মাত্র। বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া স্থল-নারীরা ঐ জল-নারীকে হার্‌লাম নগরে আনয়ন করিল। নগরের শাসনকর্ত্তা তাহার বাসের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট এবং পরিচর্য্যার নিমিত্ত একটী স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সযত্নপালনের বশবর্ত্তিনী হইয়া, নীর-নারী ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের অনেক আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল;—মনুষ্য-ভোগ্য দুগ্ধ ও রুটি আহার করিত, স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ পরিধান করিত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সূতা প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। খৃষ্টীয়ানগণের অনুকরণে মৎস্যনারী, ক্রুশ দেখিলে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিত এবং তাহার ভাব ভক্তি দেখিয়া লোকে অনুমান করিত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে তাহার কোনরূপ সংস্কার থাকিতে পারে। কিন্তু জল-ললনা মনুষ্যের ভাষা শিক্ষা করিতে সক্ষম হইল না, সুতরাং তাহার মনের ভাব মনুষ্যলোকে কিরূপে প্রচার হইবে?

হার্‌লাম নগরে ঐ নারী ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। তাহার মৃত্যু হইলে পর মৃত খৃষ্টীয়ান মনুষ্যকে যেরূপে গোর দেয়, তাহাকেও সেই প্রণালীতে হার্‌লামবাসীরা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়াছিল।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ড হুইট্‌বোর্‌ণ সাহেব সেণ্ট জন হার্‌বর নামক সমুদ্র-শাখায় একটি মৎস্যনারী দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি কহেন, দূর হইতে ঐ নারীর মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ রেখাকার দৃষ্ট হইয়াছিল;—বোধ হয় ঐ কৃষ্ণবর্ণ রেখা আর্দ্র কেশজাল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন নাই,

যেহেতু জলনায়িকা নিকটবর্ত্তিনী হইবামাত্র কাপ্তেন ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে সমুদ্রসুন্দরী আর এক নৌকার নিকটে যাইয়া তুষারধবল একখানি হাত তুলিয়া ঐ নৌকার পার্শ্বদেশ ধারণ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে নৌকার লোকেরা ভয় পাইয়া দণ্ডদ্বারা তাহার করে আঘাত করায় তথা হইতে পলায়ন করে। তদনন্তর ঐরূপে অন্যান্য নৌকার সমীপস্থ হইয়াছিল। এই ঘটনায় তথাকার সমুদয় নৌকার লোকেরা ভয় পাইয়া তীরে অবতীর্ণ হয়, সুতরাং সেই নীরাঙ্গনার আর কোন সন্ধান হয় নাই।

ইংরাজী গ্রন্থে নীরনারীর এই সকল বিবরণ পাঠ করিবার পূর্ব্বে দেশীয় কোন ব্যক্তির মুখে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, জলমধ্যে পরম রূপসী রমণীগণ বাস করে, স্থলপুরুষের প্রতি তাহাদিগের অতিশয় আসক্তি। সন্ধ্যাসমাগমে শীতল মলয়হিল্লোলে জলের উপরিভাগে প্রফুল্ল কমলতুল্য মুখ তুলিয়া তাহারা শীস্ দিয়া এরূপ সুমধুর সুরে গান করে যে, তাহা শুনিলে স্থলপুরুষেরা উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হয়, পরে কি ঘটনা হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। মৎস্যনারী নামে একখানি গ্রন্থ ইংরাজী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, বারি-বিলাসিনীরা কোন স্থলপুরুষের প্রণয়পাত্রী হইতে পারিলে অমরত্ব লাভ করিতে পারে। অমরত্বের লোভে একটি নবীনা নীরকামিনী একজন স্থলপুরুষের প্রেমার্থিনী হইয়াছিল, এই কল্পিত আখ্যায়িকা উক্ত গ্রন্থে অতি বিচিত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপতঃ নীরমধ্যে নারীর বাস, এ বিষয়ে আমাদিগের অবিশ্বাসই ছিল; মনে করিতাম, এ কেবল কবির কুহক মাত্র। এক্ষণে তাদৃশ জীবের অস্তিত্বে আর আমাদিগের

অপ্রত্যয় নাই। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত কাপ্তেন হুইট্বোর্ণ্ সাহেব যে জলনারী দৃষ্ট করিয়া ছিলেন, এক নৌকায় প্রহার পাইয়াও তাহার অন্য নৌকায় যাওয়ার সমাচার এবং পূর্ব্বোক্ত প্রবাদশ্রুত স্থলপুরুষের প্রতি জল-নারীর স্বতঃসিদ্ধ আসক্তি থাকার বিবরণ ও মৎস্যনারী-গ্রন্থেও সেইরূপ মর্ম্মের বর্ণনা, এই তিন বিষয়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপোষক। স্বরূপতঃ স্থলনায়কের প্রতি জলনায়িকার স্বতঃসিদ্ধ প্রেমভাব আছে, অথবা তাহার মাংসভোজনার্থে তাহাকে তদ্রূপে আকৃষ্ট করে, এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতপ্রবাদের পোষকতায় এস্থলে ইহা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য যে, হোমর নামে প্রাচীন গ্রীক কবি অডেসি অভিধেয় যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে পাঠ করা যায় যে, সিসিলি নামক দ্বীপের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে তিনটি সিন্ধু-নায়িকা বাস করিত। তাহারা কোন তরণী দেখিতে পাইলে এরূপ মধুর স্বরে গান করিত যে, যাত্রীরা তরীর গতি স্থগিত করিয়া গীত শুনিতে শুনিতে আহার ইত্যাদি অতি আবশ্যক কার্য্যও বিস্মৃত হইয়া থাকিত; তন্নিবন্ধন অবশেষে উপবাসে তাহাদিগের জীবনান্ত হইত। হোমর কবির নায়ক ইউলিসিস্ নামক রাজা অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি ঐ স্থান পার হইবার সময়ে নাবিকগণের কর্ণকুহর এরূপ নিবিড়রূপে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা ঐ গীত শুনিতে না পায়; পরে আপনার শরীর জাহাজের মাস্তুলের সহিত অতি দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখেন। ঐ সঙ্কটাপন্ন স্থলে তরণী উপস্থিত হইলে, সিন্ধুসুন্দরীগণের কলকণ্ঠের গীত শুনিয়া ইউলিসিস্ অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া নাবিক গণকে তরণীর গতি স্থগিত করিতে বারম্বার আদেশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বধির-ভাবাপন্ন নাবিকেরা ঐ গীত, বা তাঁহার আদেশ, কিছুই

শুনিতে পাইল না; সুতরাং নৌকা ক্রমে ক্রমে ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিল। ইউলিসিসের শ্রবণবিবর বদ্ধ ছিল না, তিনি বুদ্ধির বলে গীতও শুনিলেন, প্রাণেও বাঁচিলেন। কথিত আছে, ইউলিসিস্‌কে বিমোহিত করিতে না পারিয়া ঐ তিন রমণী ক্ষোভে সাগরনীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। শীস্ দিয়া মৎস্যনারীর পুরুষ আকর্ষণের প্রবাদ এবং হোমর কবির সিন্ধুনায়িকার এই বর্ণনা, এক মূল হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে, অথবা উভয়ই অমূলক; তাহার মীমাংসার ভার পাঠকগণের নিজ নিজ বুদ্ধির প্রতি সমর্পিত রহিল।

মৎস্য-নারীর সম্বন্ধে আমাদিগের আর কিছু বলিবার নাই। মৎস্য-পুরুষসম্বন্ধে শ্রুত হওয়া যায় যে, ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সসেক্স প্রদেশের সমুদ্রে একটি মৎস্য-পুরুষ ধৃত হইয়াছিল। ঐ পুরুষ অনেক বিষয়ে স্থলপুরুষের ন্যায় আচরণ করিত, কেবল কথা কহিতে পারিত না। মৎস্য-পুরুষ ধৃত হইয়া ছয় মাস কাল মাত্র জীবিত ছিল।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই জাতির দুইটি শাবক দৃষ্ট হওয়ার বিবরণ ইংলণ্ডের একখানি সংবাদপত্রে এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়;—ইংলণ্ডের সন্নিকটে আইল অব্ ম্যান নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তথাকার তিনজন বণিক জলবিহঙ্গ শিকার করিবার মানসে সমুদ্রের খাঁড়িতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে বিড়ালশাবকের ধ্বনির ন্যায় কোন জীবের শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা চতুর্দ্দিকে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জলের অনতিদূরে একটি শৈলের গহ্বরমধ্যে দেখিলেন, অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ মীনাকার দুইটি ক্ষুদ্র জীব রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি গতজীবিত অবস্থায় ধরাপরে নিপতিত রহিয়াছে, অপরটি বিড়াল-শিশুর ধ্বনিতে রোদন করিতেছে। মৃতটির শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া

গিয়াছে। পূর্ব্বরাত্রে তথায় প্রবল ঝড় হইয়াছিল, বোধ হয় তাহাতেই তরঙ্গের আঘাতে ক্ষতাঙ্গ হইয়া তাহার জীবনান্ত হইয়াছিল। জীবিত শিশুটিকে তাঁহারা আপনাদিগের নিবাসস্থান ডগ্‌লাস নামক নগরে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার শরীরের পরিমাণ মস্তক হইতে পুচ্ছ প্রান্ত পর্য্যন্ত কিঞ্চিন্ন্যূন ৪ ফুট; স্কন্ধদেশের বিস্তার ৫ ইঞ্চি, ত্বক তরল পাটল বর্ণের এবং পুচ্ছভাগের শল্ক সমুদয় ঈষৎ রক্ত বর্ণ। চুলগুলি নীলবর্ণের, প্রায় ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ, এবং মস্তক হইতে মুখমণ্ডলে আলুলায়িত হইয়া রহিয়াছে। স্পর্শ করিলে চুলগুলিতে আঠার ন্যায় অনুভব হয়;—সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী শৈলোপরি যে একপ্রকার শৈবাল জন্মে, চুলগুলি দেখিতে প্রায় সেইরূপ। মুখের ছিদ্র ক্ষুদ্র, তন্মধ্যে দন্ত নাই। শাবকটিকে জলের টবে রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে সে পরমানন্দে সন্তরণ করিত। চিংড়ি মৎস্য পাইলে পুলক প্রকাশে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিত, এবং পেনকলমের মধ্যে পুরিয়া দুগ্ধ ও জল মুখের নিকটে ধরিলে তাহাও পান করিত। যে সময়ে সংবাদপত্রে এই বিবরণ লিখিত হয়, তখনও শাবকটি জীবিত ছিল, পরে কোন্ সময়ে মরিয়া যায়, তাহার কোন সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

স্মরণ করা উচিত, উপরে শরীরের যে বর্ণনা করা হইল, তাহা শাবক শরীরের বর্ণনা। পূর্ণাবস্থায় শরীরের পরিমাণ কিরূপ হয়, পূর্ব্বোক্ত বর্ণনায় তাহার নিশ্চিত নিরূপণ হয় না। অধিকন্তু মৎস্যজাতীয় নরনারীরা কিরূপে অপত্য উৎপাদন ও প্রসব করে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহাদিগের মল মূত্র ত্যাগের যন্ত্র, শরীরের কোন্ স্থানে কি আকারে আছে, সংগৃহীত বিবরণে তাহার কোন উল্লেখ না থাকার কারণ কি? বোধ হয়, সভ্য সংগ্রহকারকেরা অশ্লীল বোধে তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

এই বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকের মৎস্যাবতারের কথা স্মরণ হইতে পারে, কিন্তু পুরাণ প্রমাণে মৎস্যাবতারে ভগবান অবিকল মীনশরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদিগের বর্ণিত অর্দ্ধ নর, অর্দ্ধ মীনাকার জীব, তাঁহার বংশমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না! মৎস্যাবতারের বিপুল মীন-কলেবরের ললাটদেশে বিশাল বিষাণ ছিল;—তদ্ভিন্ন সাধারণ মৎস্যের সহিত তাঁহার অবয়বগত আর কোন প্রভেদ ছিল না। "প্রলয়পয়োধিজলে" পৃথ্বীপিণ্ড পিণ্ডালুর ন্যায় নিমগ্ন হইলে, হিমাচলের উপরিভাগে ভাসমান সত্যব্রত মনুর তরণী, বাসুকিরজ্জুর যোগে ঐ শৃঙ্গমূলে নিবদ্ধ হইয়াছিল। এই মহান্ বিষয়ের সবিস্তার বিবরণ যাঁহারা জ্ঞাত হইতে চাহেন, তাঁহারা মৎস্য পুরাণ পাঠ করিয়া দেখিবেন।*

---

* কোন এক সময়ে সমগ্র পৃথিবী জলমগ্ন ও সমুদয় স্থাবর জঙ্গম পদার্থ তাহাতে বিনষ্ট হইয়াছিল, পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাও শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ জলপ্রলয় হইতে একজন ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ও তাঁহার কতিপয় স্বগণ মাত্র রক্ষা পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত পুরাণে লিখিত আছে, ঐ ব্যক্তিব নাম সত্যব্রত; তাঁহার অপর নাম বা উপাধি মনু। মুসলমানগণের গ্রন্থানুসারে তাঁহার নাম নু, এবং খৃষ্টীয়ানগণের বাইবলে তাঁহার নাম নোয়া লিখিত আছে। সম্ভবতঃ এক নামের উচ্চারণের প্রভেদবশতঃ 'মনু, নু ও নোয়া, এই তিন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সে যাহা হউক, কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, সমগ্র পৃথিবী কোন সময়েই জলে নিমগ্ন হয় নাই, পৃথিবীর প্রদেশবিশেষে তাদৃশ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। 'বৃক্ষের কলেবরে ও শাখায় মণ্ডলাকার স্তর সঞ্চার হইয়া যে আয়তন বর্দ্ধন করে, তাহার দ্বারা বৃক্ষের বয়স গণনা করিবার সঙ্কেত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আবিষ্কার

নিকোলাস নামক ডুবারি।

মনুষ্য একাগ্রমনে যে বিষয়ে যত্ন করে, তাহাতেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। প্রকৃতি অনেক কার্য্যে প্রথমে তাহার বাধা জন্মান বটে, কিন্তু যথাযুক্ত সাধনার বলে অবশেষে অবশ্যই তাঁহাকে অনুকূল ও আয়ত্ত হইতে হয়। ভূমণ্ডলে আর কোন প্রাণীর সিদ্ধি-লাভের এরূপ ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সিসিলি রাজ্যে ফ্রেডেরিক রাজার সময়ে নিকোলাস নামে একব্যক্তি

করিয়াছেন। আমেরিকায় অনেক প্রাচীন বৃক্ষ আছে, উক্ত সঙ্কেতানুসারে বয়স গণনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, বাইবলের লিখিত নোয়ার জলপ্লাবনের সময়ের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ঐ সকল বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। যদ্যপি নোয়ার পূর্ব্ব সময়ের বৃক্ষ বিদ্যমান থাকে, তবে নোয়ার সময়ে সমগ্র পৃথিবী জলে মগ্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব হয়? তাহা হইলে ঐ সকল বৃক্ষও বিনষ্ট হইয়া যাইত। এস্থলে বক্তব্য এই, বাইবল গ্রন্থের মতে পৃথিবী কিঞ্চিন্ন্যূন ছয় হাজার বৎসর মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। নোয়ার সময় সুতরাং তাহা অপেক্ষাও আধুনিক। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে মগধের রাজবংশ ধরিয়া ধারাবাহিকরূপে গণনা করিলে চারি হাজার বৎসরেরও অধিক সময়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের দুই হাজার বৎসর মাত্র পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথায় সহসা আমাদিগের প্রত্যয় হয় না। যেহেতু যুধিষ্ঠিরের বহু পূর্ব্বে সগরপ্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজারা অযোধ্যায় রাজ্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা যে পৌরাণিকগণের কল্পনা-সম্ভূত পুরুষ নহেন, সে বিষয়ের অনেক বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দু, মিসরী, চীনা, গ্রীক, পৃথিবীর মধ্যে ইহাঁরাই প্রাচীন জাতি; ইহাঁদিগের মতানুসারে পৃথিবীর আদি সৃষ্টির নিরূপণই হইতে পারে না। ইহাঁরা পৃথিবীর সৃষ্টির নির্দ্দেশ করেন মাত্র, কিন্তু দিন বা বৎসর গণনার দ্বারা সে সময়ের নিরূপণ করিতে পারেন না। কেবল য়িহুদিদিগের বাইবলে পৃথিবীর জন্ম দিনের নিরূপণ আছে, এবং সে দিন, বর্ত্তমান সময় হইতে ছয় হাজার বৎসরের অধিক নহে। ভূতত্ত্ববিদ্যার যত উন্নতি হইতেছে, ততই তদ্দ্বারা হিন্দুপ্রভৃতি জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের মতের পোষকতা হইতেছে;— সভ্য খৃষ্টীয়ানেরা তথাচ ইহাঁদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রকে অলীক গ্রন্থ এবং হিন্দুপ্রভৃতিকে ধর্ম্মান্ধ বলিয়া উপহাস করিতে ক্রটি করেন না।

বাস করিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় জলে অতিবাহিত করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে মৎস্য বলিয়া ডাকিত। সমুদ্র হইতে প্রবাল ও শুক্তি তুলিয়া বিক্রয় করিয়া নিকোলাস জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে জলে বাস করিতে নিকোলাসের এরূপ পটুতা জন্মিল যে, তিনি কখন কখন চারি পাঁচ দিবস অহোরাত্র জলেই যাপন করিতেন। সে সময়ে অন্যান্য বৃহৎ জলজন্তুর ন্যায় কাঁচা মৎস্য আহার করিয়াই তিনি ক্ষুন্নিবারণ করিতেন। সমুদ্রের যেসকল স্থান জাহাজের গতি-বিধির পক্ষেও ভয়াবহ, নিকোলাস অকুতোভয়ে সন্তরণের দ্বারা সে সকল স্থান পার হইতে পারিতেন। তিনি এক নগর হইতে পত্র লইয়া, সমুদ্রপথে সন্তরণের দ্বারা নগরান্তরে পৌঁছাইয়া দিতেন। এক সময়ে একখানি জাহাজের নাবিকেরা দূর হইতে জলোপরি একটি বৃহৎ জীবকে দেখিয়া,জলজন্তু অনুমান করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া নিকোলাস গমন করিতেছেন। সে দিবস প্রবল বায়ু বহমান থাকায় সমুদ্র নিতান্ত অশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু জলবিহারী নিকোলাসের তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কার সঞ্চার হয় নাই। নাবিকেরা তাঁহাকে জাহাজে উঠাইয়া লইয়া, গন্তব্য স্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হইল যে, তিনি ইটালি রাজ্যের কোন এক নগরে লিপিবাহক হইয়া গমন করিতেছেন। তাঁহার নিকট যেসকল পত্র ছিল, নাবিকেরা দেখিল তৎসমুদয় চর্ম্মাবরণে এরূপ নিবিড়রূপে বিজড়িত যে, তাহাতে কণামাত্র জল প্রবেশ করিতে পারে নাই। নিকোলাস কতিপয় দিবস জাহাজ আরোহণেই চলিলেন, তদনন্তর এক দিবস উত্তমরূপে আহারাদি করিয়া নাবিকদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রে

অবতীর্ণ হইয়া সন্তরণ অবলম্বনে স্বীয় গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

জলে বাস করিতে নিকোলাসের যে, ঈদৃশ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু প্রকৃতি তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া যে, একটি অসম্ভাবনীয় আনুকূল্যের বিধান করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া বিস্মিত হইতে হয়। দীর্ঘকাল জলে বাস করিতে করিতে নিকোলাসের করচরণাঙ্গুলির অবকাশমধ্যে চর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া হংসচরণের ন্যায় অঙ্গুলিগুলিকে পরস্পর সংযত করিয়াছিল। এইরূপ লিপ্তচর্ম্ম করপদের দ্বারা যে, সন্তরণ কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়, তাহা অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসে যাঁহারা মহা মহা ক্লেশ স্বীকার করেন, প্রকৃতির ঈদৃশ আনুকূল্যের সমাচার তাঁহাদিগের ভরসার কারণ হইতে পারে। শ্বাসপ্রশ্বাস বিষয়েও নিকোলাসের বিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি এক নিশ্বাসে প্রচুর পরিমাণে বায়ু আকর্ষণ করিয়া একঘণ্টা কাল জলমধ্যে অতিবাহিত করিতে পারিতেন।

সিসিলির সমুদ্রে কারিব্‌ডিস নামে একটি ভয়ানক আবর্ত্ত আছে। তথাকার জল সর্ব্বদাই অস্থিরভাবাপন্ন, এবং জলের মধ্যে পর্ব্বতেরও অধিষ্ঠান আছে। স্থানটি এরূপ ভয়ানক যে, কারিব্‌ডিস পার হইবার সময়ে নাবিকগণকে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। ঐ জলের তলভাগে কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে, সকলেরই মনে আবহমান কাল এই সংস্কার ছিল, কিন্তু কাহার সাধ্য যে, সাক্ষাৎ কালচক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান সে জলে নিমগ্ন হইয়া তলভাগের সমাচার আনয়ন করে? নীরনিবাসী নিকোলাসের বিবরণ ক্রমে ক্রমে সিসিলির রাজার কর্ণ-গোচর হওয়ায় তিনি তাঁহাকে রাজসভায় আনিবার নিমিত্ত লোক

প্রেরণ করিলেন। কিন্তু স্থলবাসিগণের পক্ষে নিকোলাসের সাক্ষাৎ লাভ করা বড় সুলভ বিষয় নহে;—বিস্তর অন্বেষণের পর রাজদূতেরা তাঁহাকে লইয়া রাজসভায় সমাগত হইল। নিকোলাসকে দেখিয়া রাজার কারিব্ডিসের কথা স্মরণ হইল। রাজা তাঁহাকে ঐ জলের তলভাগ দেখিয়া আসিতে আদেশ করায় নিকোলাস তাহাতে অসম্মত হইলেন। তথাকার জলে যে, নানাপ্রকার প্রাণান্তিক বিপদের সম্ভাবনা আছে, জল-পরীক্ষাপটু নিকোলাস তাহা অবগত ছিলেন, তন্নিমিত্তই তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কিন্তু রাজাদিগের কৌতূহল একবার উদ্দীপ্ত হইলে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে;—সহস্র সহস্র জনের প্রাণ নষ্ট হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাচ একজনের নিরর্থক অভিলাষকে অবশ্যই পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। রাজা আদেশ করিলেন, ঐ জলে একটী মহামূল্য স্বর্ণপাত্র নিক্ষিপ্ত হউক, নিকোলাস যদ্যপি তাহা উঠাইয়া আনিতে পারেন, তবে পুরস্কারস্বরূপে ঐ পাত্র তাঁহাকে প্রদান করা যাইবে। রাজার আগ্রহ, পুরস্কারের লোভ, বিশেষতঃ সাধারণসমীপে স্বীয় জলনৈপুণ্যপ্রদর্শনের লালসা, নিকোলাসকে একবারে বিমোহিত করিয়া তুলিল। তিনি অবশেষে কারিব্ডিসে ডুবিতে সম্মত হইলেন। রাজার আদেশানুসারে ঐ উন্মত্ত জলকল্লোলমধ্যে স্বর্ণপাত্র নিক্ষিপ্ত হইল;—অতিবিলম্বে নিকোলাসও তাহার অনুগামী হইলেন। প্রায় দুই দণ্ড কাল পর্য্যন্ত রাজা পারিষদগণ সহ তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন, তথাচ নিকোলাস উঠিলেন না। ইহাতে সকলেরই মনে হইল, নিকোলাসকে আর উঠিতে হইবে না; ইতিমধ্যে রাজার নয়নগোচর হইল, নিকোলাস এক হস্তে স্বর্ণপাত্র ধারণ করিয়া অপর হস্ত দ্বারা সন্তরণ করিতে করিতে স্থলাভিমুখে আগমন করিতেছেন। তীরে উঠিবামাত্র সকলেই উচ্চনাদে

তাঁহার প্রশংসা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। নিকোলাস অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিয়া, রাজা তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তৎকালে তাঁহাকে বিদায় প্রদান করিলেন। বিশ্রামান্তে সুস্থ হইলে নিকোলাস পুনর্ব্বার রাজসভায় সমানীত হইলেন। রাজা কারিব্‌ডিসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় নিকোলাস কহিলেন, তথায় যে সকল মহা মহা বিপদ আছে, আমি অগ্রে তাহার অর্দ্ধেক বুঝিতে পারিলেও ঐ প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইতাম না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ঐ স্থান জলজন্তুগণের পক্ষেও ভয়ানক! প্রথমতঃ, তাহার তলভাগ হইতে সর্ব্বদাই জলরাশি ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বলিত হইতেছে, ঐ জলের বেগ সম্বরণ করে কাহার সাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, জলমধ্যে যে পর্ব্বত আছে, তাহা দণ্ডাকার সরলভাবে সমুন্নত হইয়া রহিয়াছে, কোন মতে তাহাতেও আশ্রয় লাভের উপায় নাই। তৃতীয়তঃ, ঐ পর্ব্বতের প্রতিরোধে জলের বেগ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে এরূপ বলে আঘাত করিতেছে যে, সে আঘাত লাগিলে শরীর চূর্ণ হইয়া যায়। চতুর্থতঃ, জলের মধ্যে অতি বিপুলায়তন প্রবালকানন;—তাহার শাখামণ্ডলীর মধ্যগত হইলে নিষ্কৃতি লাভ করা সুকঠিন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তুমি কিরূপে এত সত্বর স্বর্ণপাত্র লইয়া প্রত্যাগমন করিলে? নিকোলাস কহিলেন, ঐ পাত্র পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে একটী গহ্বরমধ্যে নিপতিত হইয়াছিল;—তলভাগে প্রবেশ করিতে পারে নাই; আমি মজ্জনসময়ে পথি মধ্যে দেখিতে পাইয়া গ্রহণান্তে প্রত্যাগমন করিয়াছি। নিকোলাস তলভাগ পর্য্যন্ত গমন করেন নাই শুনিয়া রাজার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইল। তলভাগের সমাচার জানিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি নিকোলাসকে আর একবার নিমগ্ন হইতে আদেশ করিলেন। নিকোলাস বারম্বার অনিচ্ছাপ্রকাশ করিতে

লাগিলেন, রাজাও বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনুরোধের পোষকতার জন্য রাজা আদেশ করিলেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ আর একটি স্বর্ণপাত্র পুনর্ব্বার জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হউক, তাহাও নিকোলাসকে পুরস্কারস্বরূপে প্রদান করা যাইবে। দরিদ্র নিকোলাস ধনলোভে পুনর্ব্বার ঐ আবর্ত্তে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর তথা হইতে উত্থান করিতে হইল না! চিরপ্রিয় সমুদ্রগর্ভে তিনি চির দিনের নিমিত্ত বিশ্রাম করিলেন।

ধন ও যশোলোভে নিকোলাসের ন্যায় কত শত ব্যক্তি যে, অসাধ্য-সাধনরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। সমুদ্রের তল হইতে স্বর্ণপাত্র আহরণ করিবার লোভে কেবল যে, নিকোলাসের জীবনান্ত হইয়াছে এরূপ নহে, অনেকেরই অদৃষ্টে এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে।

অগ্নিপিণ্ড।

বিশ্বসংসারের সকল স্থানই আশ্চর্য্য বিষয়ে পরিপূর্ণ।—সিন্ধু, শৈল, বন, যেখানে বিচরণ করিবে, সেইখানেই বুদ্ধির অতীত শত শত বিষয় দেখিতে পাইবে। গগনমণ্ডলে মনুষ্যের গমনের শক্তি নাই, কিন্তু তথাচ তাহার আশ্চর্য্য ব্যাপারসমূহ দর্শনের বাধা হয় না। নর-নয়নগোচর করিবার অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর আকাশের বস্তুসমস্তকে মনোমোহন জ্যোতির্ম্ময় শরীর প্রদান করিয়াছেন;—তাহারা দূরে থাকিয়াও রূপের ছটায় জগৎ আলো করিয়া রহিয়াছে;—তাহাদিগের রূপের তুলনা নাই। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, এ সকল কি সুন্দর পদার্থ!

এ সকলের তুলনায় অন্যান্য বস্তু নিতান্ত শ্রীহীন ও মলিন বোধ হয়। যিনি ঊষার উদয়ে উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া অতিদূরে বিপুল লোহিত ভানুমণ্ডলের প্রথমপ্রকাশ নয়নগোচর করিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে আর কোন বস্তুই মহিমান্বিত বলিয়া অনুভূত হইবে না। যাঁহার কমনীয় কৌমুদী-কুহক প্রভাবে মৃণ্ময়ী পৃথিবী, সুরপুরীর ন্যায় লক্ষিত হয়; বিশ্ববিনোদন সেই চন্দ্রমার তুল্য কান্তিমান্ পদার্থ আর কোথায়? নিঃশব্দ নিশীথসময়ে আকাশের সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য তারকাপুঞ্জের সজীব নিমেষ-উন্মেষক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে কাহার অন্তরে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় না হয়?—মর্ত্যলোকের সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সে সময়ে কাহার অন্তরাত্মা নক্ষত্রনিকরে বিচরণ করিতে ইচ্ছা না করে? সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়াই তাহাদিগের মহিমা তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম হয় না, কিন্তু সেই অভ্যস্ত সুখের ব্যাঘাত ঘটিলে হৃদয় যে কিরূপ কাতর হয়, তাহা যিনি অন্ধকার কারাগার মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র নিত্য দৃষ্ট পদার্থ,—মেঘ, বিদ্যুৎ, করকা ঋতু অনুসারে লক্ষিত হয়,—কিন্তু এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে আকাশে অন্যান্য আশ্চর্য্য পদার্থসমূহও নেত্রগোচর হইয়া থাকে;—যেমন অগ্নিপিণ্ড।

অগ্নিপিণ্ডের অপর নাম উল্কা। অগ্নিপিণ্ড সময়ে সময়ে আকাশ হইতে নিপতিত হয়; ইহার পতনের কোন নির্দ্ধারিত ঋতু নাই, অথবা চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণের ন্যায় গণনা করিয়া অগ্রে কালনিরূপণ করিবার কোন শাস্ত্রও এতাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। মনুষ্য বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে তাহার আবির্ভাব অবলোকন করেন মাত্র, তদ্ভিন্ন এতাবৎ তাহার সম্বন্ধে আর কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

ইংরাজী ১৮৬৮ সালের ৭ই অক্টোবরে একটি আশ্চর্য্য অগ্নিপিণ্ড নিপতিত হয়। ফরাশি রাজ্যের প্যারিস ও রোয়েন নগর, এবং ইংলণ্ডের লণ্ডননগর,—পরস্পর অতিদূরবর্ত্তী এই তিন নগর হইতে উহার আবির্ভাব এক সময়েই লক্ষিত হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সীমায় উপস্থিত হইয়াছে;—গগনমণ্ডল নির্ম্মল, কোথাও মেঘের সংস্রব নাই;—চন্দ্রমা ও তারকা-নিকর প্রস্ফুটিত রহিয়াছে; এরূপ সময়ে আকাশ প্রদেশ অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দ্রব্যসংযোগের দ্বারা উৎসব দিবসে যেরূপ কৃত্রিম আলোক প্রস্তুত করা হয়, ঐ আলোকের আভাও তদনুরূপ, কিন্তু এরূপ উগ্রপ্রভাসম্পন্ন যে, তাহাতে চন্দ্রের জ্যোতি বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। দর্শকগণের মধ্যে অনেকে তাহার প্রখর-চ্ছটা সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ পরিবর্ত্তিত ও নয়ন নিমীলিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

প্রথমে ঐ অগ্নিপিণ্ড আকাশের উচ্চতম স্থল হইতে উজ্জ্বল বর্ত্তুল আকারে স্খলিত হয়।—উচ্চতম স্থান হইতে নিপতিত হইয়াছিল, এই নিমিত্তই পরস্পর অতি দূরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত তিন নগরের লোকেরা এক সময়েই উহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।—পরে ঐ পিণ্ড উত্তর হইতে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ দিকে মন্দ মন্দ বেগে গমন করে, তৎকালে তাহার বর্ত্তুল কলেবর অল্পে অল্পে প্রসারিত হইয়া অবশেষে ধূমকেতুর আকার ধারণ করে। ঐ ধূমকেতু-রূপের লম্বমান পুচ্ছের মূলদেশ প্রগাঢ় সবুজ বর্ণে সুরঞ্জিত ছিল, পরে ঐ সবুজ বর্ণের স্রোত ক্রমশঃ লোহিত, নীল ও ধূমল বর্ণের শত শত রেখানিকরে বিকীর্ণ হয়; এইরূপ আকার ধারণ করিয়া অতি বিচিত্র শোভা বিস্তারিত করিতে করিতে ঐ অগ্নিপিণ্ড ধীরে ধীরে ধরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে ঐ

উল্কা হইতে একটি শব্দ সমুৎপন্ন হয়;—শব্দটি দুইটি কামানের সম্মিলিত শব্দের তুল্য। রোয়েন ও প্যারিস নগরের লোকেরা ঐ শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু লণ্ডনের লোকেরা শুনিতে পায় নাই। ফরাশি রাজ্যের নাভেরণি প্রদেশে ঐ উল্কা অবশেষে নিপতিত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। তাহার পাষাণময় কলেবরের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক দুই হস্ত এবং পরিধি প্রায় দেড়হস্তপরিমিত ছিল।

অগ্নিপিণ্ডের পাষাণময় শরীরের কথা শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, কিন্তু মনে করা উচিত, জগতের প্রত্যেক বস্তু—প্রত্যেক ঘটনা—আশ্চর্য্যের উপকরণে পরিপূর্ণ। আকাশজ অগ্নিপিণ্ড কেবল তরল অনলমাত্র নহে, স্বরূপতঃ তাহার শরীর আছে। ঐ শরীর সামান্যতঃ পাষাণময় বলা যায় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা বিবিধ ধাতু-পদার্থ দ্বারা বিনির্ম্মিত; তন্মধ্যে লৌহ ও গন্ধকের অংশই অধিক। ঢালাই চীনের লোহার যেরূপ বর্ণ, ইহার বর্ণও সেইরূপ। ইহার শরীর বর্ত্তুলাকার এবং তাহার উপরিভাগ একপ্রকার কঠিন ত্বচের দ্বারা আবৃত। পতিত হইবার সময়ে উল্কাপিণ্ড হইতে দহ্যমান গন্ধকের অতি উগ্র ঘ্রাণ বহির্গত হয়। যে সকল পিণ্ডে গন্ধকের সমধিক ভাগ থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত কোমল হয়; এবং পতিত হইয়া অতি অল্প কালমধ্যে চূর্ণে পরিণত হইয়া যায়। অগ্নিপিণ্ড ভাঙ্গিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাহার বর্ত্তুলবপু যেন কেন্দ্রস্থল হইতে শিরাকারে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে সকল উল্কাপিণ্ড পতনের পূর্ব্বে শব্দায়মান হয়, তাহাদিগের শরীর বিলাতি আলুর ন্যায় অসমতল হইয়া পড়ে। পতনের পর পিণ্ডের শরীর কিয়ৎক্ষণ উত্তপ্ত থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া যায়।

উল্কাপাত অনেকানেক স্থানে হইয়া গিয়াছে। ১৭৯৮ সালে কাশী ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ৮ ক্রোশের লোকেরা একটি উল্কাপতন দর্শন করিয়াছিলেন। ১৮০৩ সালে নর্ম্যাণ্ডি রাজ্যে একটি উল্কা-স্খলন দৃষ্ট হইয়াছিল; দিবাভাগে ঐ উল্কা নিপতিত হয়, তথাচ তাহার প্রখরপ্রভা প্রভাবে প্রায় একক্রোশ পরিমিত স্থানবাসিগণের নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল। ঐ উল্কা শূন্যপথে শব্দায়মান ও বিদীর্ণ হইয়া শিলা-বর্ষণের ন্যায় বহু খণ্ডে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়াছিল। ১৮৬৫ সালের ২৯ এ এপ্রিলে ইংলণ্ডে একটি উল্কা পতন হয়। মাঞ্চেষ্টর এবং ওয়েষ্টন স্থপরমেয়র, এই উভয় স্থানের লোকেরা এক সময়েই ঐ উল্কা দেখিতে পাইয়াছিল। হার্সেলনামক একজন পণ্ডিত নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, ঐ উল্কা লিচ্‌ফিল্ড নগরের উপরিভাগে প্রথমে প্রকাশ পায়, তৎকালে উহা পৃথিবী হইতে ২৬ ক্রোশ উপরে ছিল। প্রতি সেকণ্ডে ১০ ক্রোশ পরিমাণে গমন করিতে করিতে ঐ পিণ্ড ক্রমে অক্সফোর্ড নগরের উপরে উদয় হয়, তৎকালে ধরাতল হইতে তাহার ব্যবধান প্রায় ১৯ ক্রোশ। ঐ স্থান হইতেই উল্কাটি অদৃশ্য হইয়া যায়; কোথায় নিপতিত হইল, কেহ জ্ঞাত হইতে পারেন নাই।

উল্কাপিণ্ডের শরীরের ভার নিতান্ত সামান্য নহে। ১৪৯২ সালের ৭ই নবেম্বরে আসলেস্ প্রদেশে যে উল্কাপিণ্ড নিপতিত হয়, তাহার ভার তিন মণ দশ সের। পতনের বেগে ঐ পিণ্ড দুই হস্ত পরিমাণে পৃথিবী ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইটালি রাজ্যের ভেরোনা প্রদেশে দুইটি উল্কা নিপতিত হয়, তাহার একটি তিন মণ ত্রিশ সের, আর একটি দুই মণ কুড়ি সের। অনেক স্থানে ইহা অপেক্ষাও বৃহদায়তন ধাতুপিণ্ডসমূহ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অনেকে অনুমান

করেন, ঐ সকল ধাতুপিণ্ড উল্কার শরীর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, যেহেতু সে সকল স্থানে উল্কা ভিন্ন তাদৃশ পদার্থ সদ্ভাবের অন্য হেতু উপলব্ধি হয় না।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কহেন যে, বিবিধ পদার্থের অণুপুঞ্জ, সূর্য্যমণ্ডলের সন্নিকটে ভ্রাম্যমাণ আছে। সেই সকল অণুর যোগে অগ্নিপিণ্ডের শরীর বিনির্ম্মিত হয়, পরে গুরুত্বনিবন্ধন নিপতিত হইবার সময়ে পার্থিব বায়ুর স্পর্শে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যেগুলির আয়তন ক্ষুদ্র, তাহারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শূন্যপথে ভস্মীভূত হইয়া কণারূপে নিপতিত হয়; আর যেগুলি বৃহদায়তন, তাহারাই সশরীরে মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডলে ধাতু পদার্থ কিরূপে সম্ভবিত হয়?—আমরা জানি, পৃথিবীই ধাতুর জন্মস্থান।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পরীক্ষার দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, ৯ই আগষ্ট হইতে ১১ই আগষ্ট পর্য্যন্ত উল্কাপতনের প্রধান সময়। ঐ সময়ের মধ্যে এক দিবস দুই দিবস অথবা ক্রমিক তিন দিবস সমধিক উল্কাপাত হইয়া থাকে, এবং ৩৩ বৎসর পরে এক বৎসর ঐ তিন দিবসের মধ্যে কোন এক দিবস প্রচুর পরিমাণে অগ্নিপিণ্ডসমূহ পরিবর্ষিত হয়! এই সিদ্ধান্ত সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে অথবা কেবল ইউরোপের সম্বন্ধেই সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

যেরিবাতান সরাই।

একসময়ে পৃথিবীতে মুসলমানগণের রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ছিল। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিক্রমে সে সময়ে তাহাদিগের সমকক্ষ আর কোন জাতিই পৃথিবীতে ছিল না। তৎকালে ইউরোপের লোকেরা বিশেষ

উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। রোম রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের অত্যন্ত হীনাবস্থা উপস্থিত হয়; তৎকালে ইউরোপের লোক সমস্ত অতি অজ্ঞ এবং সমাজপদ্ধতি অতিবিশৃঙ্খলভাবাপন্ন হইয়াছিল। ইতিবৃত্ত-প্রণেতৃগণ ইউরোপের ঐ সময়কে "ডার্ক্ এজ" অর্থাৎ তমসাচ্ছন্ন কাল বলিয়া থাকেন। তদনন্তর বিদ্যা ও সভ্যতার বীজ মুসলমানগণকর্ত্তৃক ইউরোপে প্রথমে সংরোপিত হয়। ইউরোপ খণ্ডের স্পেন রাজ্য বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমানগণের অধিকারে ছিল। কালচক্রের ঘূর্ণনে সংসারের সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়;—কালক্রমে মুসলমানেরা শ্রীহীন এবং ইউরোপীয়েরা পুনর্ব্বার সকল বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে যে যে স্থানে মুসলমানগণের রাজ্য আছে, তন্মধ্যে তুরুষ্ক রাজ্যই সর্ব্বপ্রধান। তুরুষ্কের সম্রাটের উপাধি সুল্তান; তিনি মুসলমানগণের পরম পূজনীয়। ইংরাজী ভাষায় তুরুষ্কের রাজধানীকে কনষ্টাণ্টিনোপল বলে, মুসলমানেরা তাহাকে কুস্তন্তুনিয়া, ইস্তাম্বুল ও রুম বলিয়া থাকেন। কনষ্টাণ্টাইন নামক রোমের একজন সম্রাট্ প্রাচীন রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া তুরুষ্ক রাজ্যে যাইয়া ঐ নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; তদবধি তাহা রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কারণে মুসলমানেরা তাহাকে রুম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, স্বরূপতঃ তাহা প্রকৃত রোম নগর নহে। যাহার প্রতাপে এক সময়ে পৃথিবী বিকম্পিত হইত, সেই রোমনগরের স্থান ইটালি রাজ্যে; তথায় অদ্যাবধি ঐ নগর নিজনামে বিখ্যাত রহিয়াছে।

কতিপয় বৎসর গত হইল, ঐ কুস্তন্তুনিয়া নগরের অধোভাগে ভূগর্ভমধ্যে একটি অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ অট্টালিকা বিশাল হ্রদমধ্যে বিনির্ম্মিত, ঐ হ্রদের বা অট্টালিকার সীমা অদ্যাবধি কেহই

নিরূপণ করিতে পারেন নাই। নগরের অধোভাগে এরূপ জলরাশি বা এরূপ অট্টালিকা আছে, এ কথা পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। কাল-ক্রমে অট্টালিকার একটি খিলান খসিয়া পড়ায় নগরবাসীরা তাহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ ভগ্ন ভাগ এক্ষণে অট্টালিকার প্রবেশ-দ্বারস্বরূপ হইয়াছে;—প্রকৃত প্রবেশের পথ কোথায় কিরূপ কৌশলে আছে, তাহা কাহারও জ্ঞাতসার হয় নাই। ভগ্নস্থানের পথে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে একটি অঙ্গন দেখিতে পাওয়া যায়, তৎপরে অতি উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর, প্রাচীরের পরেই অসীম জলরাশির মধ্যে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন অট্টালিকা। অট্টালিকার স্তম্ভগুলি এক এক খানি অখণ্ড মারবল প্রস্তর, একটি স্তম্ভ হইতে আর একটি প্রায় ছয় হস্ত অন্তরে অবস্থিত, এবং প্রত্যেক স্তম্ভের শিরোভাগ বিচিত্র কারুকার্য্যে সুশোভিত। অট্টা-লিকার অর্দ্ধাংশ জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া আছে;—হ্রদের জল গ্রীষ্মকালে কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া যায়, বর্ষাকালে পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধিত হয়। ১৮৩০ সালে একজন ইংরাজ ঐ অট্টালিকার শেষসীমা দেখিবার মানসে নৌকারোহণে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যাত্রার সময়ে তাদৃশ অন্ধকারমধ্যে গমন করিতে তাঁহাকে অনেকে নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু ইংরাজজাতি ভয় পাইবার নহে। তিনি প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখা-ইয়া একজন নাবিককে সঙ্গে লইয়া এবং নৌকার প্রান্তভাগে একটি প্রজ্বলিত মশাল বান্ধিয়া হ্রদমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। অন্ধকারমধ্যে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার নৌকার মশাল ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইতে লাগিল, অবশেষে তীরস্থ লোকেরা তাঁহার আর কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা বহুক্ষণপর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু ইংরাজপুরুষ আর প্রত্যাগত

হইলেন না। হ্রদের কোন আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহার নৌকা জলমগ্ন হইল, অথবা প্রত্যাগমনের পথ নিরূপণ করিতে না পারিয়া তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে অনশনে প্রাণান্ত হইলেন, কিম্বা ভূগর্ভস্থ বিষাক্ত বাষ্পযোগে অথবা অন্য কোন বিভ্রাটে নিহত হইলেন, তাহার আর অনুসন্ধান হইল না।

ইহাতেও ভীত না হইয়া কিছুকাল পরে আর একজন ইংরাজ ঐ পাতালনিকেতনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কোন নাবিক গমন করিতে সম্মত হইল না। সুতবাং তিনি একাকীই গমন করিলেন। অট্টালিকার একটি স্তম্ভে অতি দীর্ঘ রজ্জুর এক প্রান্ত বান্ধিয়া অপর প্রান্ত নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে নিবদ্ধ করিলেন; তদনন্তর দুইটি মশাল জ্বালিয়া নৌকার মুখভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বয়ং নৌকা বাহিতে বাহিতে অন্ধকারময় অট্টালিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তীরে বহু ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন, ইহাঁকেও আর প্রত্যাগমন করিতে হইবে না। কিন্তু চারি ঘণ্টা কাল অতীত হওয়ার পরে তাঁহার মশালের প্রভা পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল। অনতিবিলম্বেই তিনি তীরে উপস্থিত হইলেন;— তৎকালে তাঁহার শরীর অতিশয় শীতল ও বলহীন হইয়াছিল। তিনি কহিলেন, আমি দুই ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত ক্রমিক একদিগভিমুখে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তীর হইতে যাহা দেখিতেছ, তাহাই দেখিলাম মাত্র;—চতুর্দ্দিকে জলরাশি, স্তম্ভাবলী ও অন্ধকার এবং শিরোপরি অট্টালিকার শিরোভাগ;—যে দিকে চাই, ইহা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না;—অট্টালিকা ও হ্রদ যে কত দূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহার কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলাম না। তিনি প্রত্যাগত

হওয়ার পরে প্রাণ নষ্ট হইবার ভয়ে আর কাহাকেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না; সুতরাং অট্টালিকার সীমাও অদ্যাবধি অনিশ্চিত রহিয়াছে। তদ্দেশীয়েরা ঐ অট্টালিকাকে যেরিবাতান সরাই বলে। যেরিবাতান সরাই পদের অর্থ প্রচ্ছন্ন অট্টালিকা।

সুল্‌তানের বাটীর সন্নিকটে এই অট্টালিকার আর এক অংশ খসিয়া পড়ে, অন্য এক অংশ নগরের একটি কার্য্যালয়ের নিকটে স্খলিত হয়, সেণ্টসোকিয়া নামক মস্‌জিদের অনতিদূরে আর এক অংশ ভগ্ন হইয়া পড়ে, এতদ্দ্বারা য়েরিবাতান সরাই যে অতি বিপুল আয়তনের অট্টালিকা, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে; যেহেতু ঐ সকল স্থান পরস্পর অতি দূরবর্ত্তী; কিন্তু তাহার নিশ্চিত সীমা অদ্যাবধি নিরূপিত হয় নাই। কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না;—কালের আবরণ উদ্ঘাটন করিয়া সে সকল বিবরণ আহরণ করিবার উপায় নাই।

স্থানে স্থানে ভূগর্ভমধ্যে এইরূপ অট্টালিকা ও সুড়ঙ্গের আবিষ্কার হইয়াছে। আমাদিগের দেশে ভাগলপুরে একটি সুড়ঙ্গ আছে, তাহারও সীমা অদ্যাবধি নিরূপিত হয় নাই। পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে পৃথিবীর অভ্যন্তরে অট্টালিকা আবিষ্কৃত হওয়ার সংবাদ শ্রুত হওয়া যায়। বোধ হয়, শত্রুর হস্ত হইতে সম্পত্তি ও শরীররক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্বকালে রাজবর্গ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সকল প্রচ্ছন্নপুরী নির্ম্মাণ করিতেন; ইহার গতায়াতের গুপ্ত পথ কেবল গৃহস্বামীরই জ্ঞাতসার থাকিত। বর্ত্তমান কালে শিল্পকার্য্যে ইউরোপীয়েরা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভূগর্ভে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে তাঁহাদিগের যত্ন নাই, কারণ তাহার প্রয়োজনও নাই। শত্রু উপস্থিত

হইলে তাঁহারা সম্মুখযুদ্ধে কাতর নহেন, সুতরাং প্রয়োজনের অভাব হওয়াতে একটি আশ্চর্য্য শিল্পব্যাপারও বিলুপ্ত হইয়া গেল। জীবের মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি কর্ম্মিষ্ঠ, কিন্তু প্রয়োজনের উত্তেজনাই তাহাদিগের কর্ম্মিষ্ঠতার একমাত্র কারণ। অভাবের কঠোর কশাঘাত প্রাপ্ত না হইলে নরজাতি অঙ্গ সঞ্চালন করিতে চাহে না।

কোলাহলপূর্ণ এই কলিকাতা যখন কালের কবলগত হইবে; তখন ইহার অভ্যন্তর ভাগ খনন করিয়া, ড্রেণ, জল ও গ্যাসের প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ ও নল-যোজনা দেখিয়া লোকে কত প্রকারই অনুমান করিবে! ড্রেণের সুড়ঙ্গ দেখিয়া কেহ কহিবে, এই সুড়ঙ্গের জলে নৌকারোহণে রাজা ও রাজপারিষদেরা পরিভ্রমণ করিতেন; কেহ কহিবে, তাহা নহে, রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি এই সুড়ঙ্গে সংস্থাপিত থাকিত! নলগুলি দেখিয়া কেহ বা অনুমান করিবে, এগুলি একপ্রকার গুপ্ত কামান! হে কাল! তোমার করস্পর্শে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়;—কলিকাতা যে, কালে জনশূন্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! শুনিতে পাই, যে স্থলে নগাধিরাজ হিমালয় এক্ষণে গগনস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, পূর্ব্বে না কি সেই স্থলে, মকরসঙ্কুল চঞ্চল সাগর নৃত্য করিতেন! —গিরিরাজের শরীরের স্তরমধ্যে না কি জলজন্তুর অস্থিশেষ কঙ্কাল সকল দৃষ্টিগোচর হইয়াছে! হে মহামহিম কাল! তুমি সকলই করিতে পার;—কেবল হতভাগ্য বাঙ্গালীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও বলিষ্ঠ করিতে পারিলে না।

আশ্চর্য্য নিদ্রা।

রামায়ণে কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রার বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয়, এ কেবল বাল্মীকির কল্পনা মাত্র;—স্বরূপতঃ কোন প্রাণীর শরীরে ঈদৃশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অখণ্ড নিদ্রাভোগ সম্ভাবিত হয় না। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির নিদ্রার বিবরণ আমরা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি, তৎ-পাঠে প্রতীয়মান হইবে, নিদ্রাবিষয়ে ইহাঁরাও এক একজন ক্ষুদ্র কুম্ভকর্ণ। এই সকল বিবরণ সাধারণ-বিশ্বস্ত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, সুতরাং মিথ্যা বলা যায় না।

ইংলণ্ডে বাথ নামে একটি নগর আছে, তথায় স্যামুএল ক্লিণ্টন নামে একজন পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবা পুরুষ বাস করিতেন। তিনি কৃষিজীবী ছিলেন। ১৬৯৪ সালের ১৩ই মে ক্লিণ্টন নিদ্রাভিভূত হইয়া সেই এক নিদ্রায় একমাস কাল অতিবাহিত করেন। তাঁহাকে জাগাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল না। এক মাস অতীত হওয়ার পরে তিনি আপনি জাগরিত হইয়া পূর্ব্ববৎ আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদয় করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ দীর্ঘ নিদ্রায় তাঁহার শরীরের বা মনের কোনরূপ বিকৃতিভাব ঘটে নাই। তদনন্তর ১৬৯৬ সালের ৮ই এপ্রেল পর্য্যন্ত সহজভাবে ছিলেন। ৯ই এপ্রেলে তিনি পুনর্ব্বার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এবার তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের জন্য জিবস্ নামে বাথ নগরের একজন ডাক্তারকে আবাহন করা হয়। ডাক্তার তাঁহার শরীর হইতে শোণিত মোক্ষণ করিলেন, ব্লিষ্টর ও অন্যান্য উগ্র ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল দর্শিল না। এই অবস্থায় তিনি সপ্তদশ সপ্তাহ যাপন করিয়া ৭ই আগষ্ট আপনিই প্রবোধিত হইলেন,

এবং যথানিয়মে বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনার ক্ষেত্রের কার্য্য করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ক্ষেত্রে যাইয়া দেখিলেন, শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইল। যব বপন করিয়া তিনি নিদ্রিত হন, এবং নিদ্রাভঙ্গের পরেই ক্ষেত্রে আসিয়াছেন; এই অল্পকালের মধ্যে শস্য কিরূপে পক্বাবস্থায় পরিণত হইল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তদনন্তর ১৬৯৭ সালের ১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি সুস্থশরীরে ছিলেন, ঐ দিবস তাঁহার পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ ও দুইবার বমি হয়; এবং তাহার অনতিবিলম্বে তিনি পুনর্ব্বার প্রগাঢ় নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ঈদৃশ নিদ্রার সংবাদ শুনিয়া নিদ্রা প্রকৃত কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ডাক্তার অলিভার তাঁহার আলয়ে যাইয়া যত প্রকার উপায় সম্ভাবনা হইতে পারে, তৎসমুদয় প্রয়োগ করিয়া দেখিয়া স্বীকার করিলেন যে, নিদ্রা প্রকৃত বটে, ইহাতে ক্লিণ্টনের কিছুমাত্র চাতুরী নাই। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ক্লিণ্টনের নাড়ীর গতি ও শরীরের উষ্ণতা স্বভাবস্থ রহিয়াছে, কিন্তু তথাচ তিনি কোন মতেই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। অলিভারের প্রস্থানের পনের দিবস পরে আর একজন ডাক্তার যাইয়া ক্লিণ্টনের শরীর হইতে রক্তমোক্ষণ করেন, কিন্তু তাহাতেও চৈতন্য হইল না। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে ডাক্তার অলিভার পুনর্ব্বার যাইয়া দেখিলেন, ক্লিণ্টন তখনও পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়াছেন। এক ব্যক্তি ক্লিণ্টনের বাহুমধ্যে একটি আলপিন প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, কিন্তু ক্লিণ্টন তাহাতেও নড়া চড়া করিলেন না। ১৯এ নবেম্বর তিনি অল্পকালের নিমিত্ত একবার জাগরিত হইয়া তাঁহার মাতার সহিত একবার আলাপ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার গাঢ়

নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই নিদ্রা হইতে তিনি ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমভাগে প্রবোধিত হয়েন। আগষ্ট মাসে নিদ্রিত হইয়া ফেব্রুয়ারি মাসে জাগরিত হইলেন, মধ্যে অখণ্ড পাঁচ মাস কাল অতীত হইল, এবং নিদ্রারম্ভের ও নিদ্রাভঙ্গের দুই মাসের খণ্ডভাগ গণনা করিলে আর এক মাস হইতে পারে; অতএব বলিতে হইবে যে, ক্লিণ্টন ছয় মাসকাল যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রবোধিত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় নিজ কার্য্য নিষ্পাদনে নিযুক্ত হইলেন, মধ্যে যে ঈদৃশ সুদীর্ঘ নিদ্রাসম্ভোগ করিয়াছেন, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে অতঃপর আর কোন বিবরণ শ্রুত হওয়া যায় নাই।

এই ব্যক্তির নিদ্রা কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অপেক্ষাও প্রগাঢ় বলিতে হইবে। যেহেতু রাবণের চেষ্টাদ্বারা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু বিচক্ষণ ডাক্তারের চেষ্টাতেও ক্লিণ্টনের চৈতন্যের সঞ্চার হয় নাই!

ব্লান্‌চেট নামে একজন ফরাসি চিকিৎসক একটি স্ত্রীলোকের বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি আঠার বৎসর বয়সে একবার ৪০ দিবারাত্রি নিয়ত নিদ্রাবস্থায় যাপন করেন;—২০ বৎসর বয়সে একবার নিদ্রিত হইয়া ৫০ দিন অতিবাহিত করেন;—তদনন্তর ২৪ বৎসর বয়সে পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূত হন, ঐ নিদ্রা প্রায় এক বৎসর কাল অবধি স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃঃ অব্দের ২০ এ এপ্রিলে নিদ্রিত হইয়া ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে জাগরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখের সম্মুখভাগে একটী দাঁত বান্ধান ছিল, সেই দাঁতটি খুলিয়া তাহার অবকাশ মধ্য দিয়া পানীয় দ্রব্য যাহা প্রদান করা হইত, তদ্দ্বারাই নিদ্রিতাবস্থায় তিনি জীবন ধারণ করিতেন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি অঙ্গ-সঞ্চালন বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেন না;—

নাড়ীর গতি অতি মৃদু এবং শ্বাসপ্রশ্বাস অতি ক্ষীণ হইয়াছিল, কিন্তু শরীর কৃশ কিম্বা বিবর্ণ হয় নাই।

আর এক নিদ্রালু ব্যক্তির বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু বিবরণে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই। তিনি একশয়নে ৪ মাস পর্য্যন্ত নিদ্রা ভোগ করিয়াছিলেন।

উলিয়ম ফক্‌সলি নামে ইংলণ্ডের একজন কুম্ভকার ১৫৪৬ খৃঃ অব্দের ২৭এ এপ্রিলে নিদ্রিত হইয়া একাদিক্রমে ১৫ দিবস তদবস্থায় ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজবৈদ্য এবং স্বয়ং রাজা তাহাকে বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। নিদ্রিত ব্যক্তিকে প্রবোধিত করিবার যে কিছু উপায় আছে, সে সকল উপায়ই অবলম্বন করা হইয়াছিল; শরীরে দাহকর বস্তু পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তথাচ তাঁহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল না। ১৫ দিবস পরে ফক্‌সলি জাগরিত হইয়া সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন;—বোধ হইল যেন সাধারণ ব্যক্তিগণের ন্যায় তিনিও এক রাত্রি মাত্র নিদ্রিত থাকিয়া জাগরিত হইয়াছেন। ঐ ব্যক্তি ইংলণ্ডের টাক্‌সালের প্রয়োজনীয় মৃৎপাত্র সমস্ত প্রস্তুত করিতেন, এই নিদ্রার পরেও ৪০ বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে তিনি স্বীয় ব্যবসায়ের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ঈদৃশ দীর্ঘ নিদ্রা একপ্রকারের পীড়া কি না, তাহা চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা বলিতে পারেন। ইহাতে শরীরের বা মনের কোন বিকৃত ভাব ঘটে না, এ কারণ সহসা পীড়া বলা যায় না। অথচ এরূপ অস্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়া কিরূপে বা স্বভাব শব্দের বাচ্য হইতে পারে?

কোন্ কোন সিদ্ধপুরুষ একপ্রকার নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিয়া থাকেন, এরূপ প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়।

ভূকৈলাসের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষালমহাশয়দিগের বাটীতে তদবস্থাপন্ন একজন মহাপুরুষকে আনা হইয়াছিল; তাঁহার বাহ্যজ্ঞানরাহিত্য-অবস্থার বিষয় অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যেরূপ নিদ্রার বিষয় এ প্রস্তাবে বর্ণিত হইল, তাহার সহিত মহাপুরুষগণের নিদ্রার প্রধান প্রভেদ এই যে, মহাপুরুষেরা নিজ নিজ নিদ্রাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আবাহন করেন, কিন্তু এ প্রস্তাবের বর্ণিত পুরুষগণের নিদ্রা ইচ্ছায়ত্ত নহে। মহাপুরুষগণের নিদ্রার বিবরণ আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা অতঃপর প্রচার করিব।

নির্ঝরবৃক্ষ।

জগদীশ্বরের শক্তির অবধি নাই;—জ্ঞানেরও অবধি নাই এবং দয়ারও অবধি নাই। 'এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস কেবল অচেতন প্রকৃতির যোগাযোগদ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে, তদ্ভিন্ন ইহার জীবন্ত জ্ঞানবন্ত অধীশ্বর আর কেহই নাই;'—যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই শোনা কথা কহিয়া থাকেন মাত্র। ক্বচিৎ দুই এক জন যাঁহারা বিচার করিয়া বুঝিয়া নাস্তিক হইয়াছেন, তাঁহারাও বোধ হয়, ঘরে বসিয়া এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নচেৎ ব্রহ্মাণ্ডের নানাস্থানের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপারসমূহ প্রত্যক্ষ করিলে কখনই মনুষ্যের মনে নাস্তিকতার সংস্কার উদয় হইতে পারে না। আমরা নিম্নে যে বিবরণ প্রকটিত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া তাদৃশ সংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্তরে ভাবান্তর উপস্থিত হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

পূর্ব্বকালে ফেরো*নামক দ্বীপে একটিও নদ, নদী বা প্রস্রবণ ছিল না; তথাকার অসভ্য লোকেরা কূপ, তড়াগ প্রভৃতি খনন করিতেও জানিত না। ঈদৃশ অবস্থায় জলাভাবে তাহাদিগের জীবনান্ত হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু দৈবের কি আশ্চর্য্য মহিমা! ঐ দ্বীপে একজাতি বৃক্ষ ছিল, দ্বীপনিবাসী লোকেরা সেই বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে জলপ্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিত। যাঁহারা তদ্দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ বৃক্ষের কথা নিজ নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তের গ্রন্থে লিখিয়াছেন। লুই জ্যাক্‌সন নামে একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন, ঐ বৃক্ষ ইংলণ্ডের ওকনামক বৃক্ষের ন্যায় স্থূল, প্রায় ৩০।৩২ হাত উচ্চ, তাহার শাখা সকল শিথিল-ভাবাপন্ন, এবং পত্রগুলি লরেল বৃক্ষের পত্রের ন্যায় উপরিভাগে নীলবর্ণ ও অভ্যন্তরে শুভ্র। এই বৃক্ষে ফুল ফল কিছুই হয় না, এবং দিবাভাগে সূর্য্যের কিরণে শুষ্ক ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি তাহার শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বিগলিত হইতে থাকে, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রতিরজনীতেই প্রত্যেক বৃক্ষের শিরোভাগের আকাশে এক এক খণ্ড মেঘ বিরাজিত হয়। কিন্তু যে বারি বর্ষিত হয়, তাহা মেঘ হইতে নহে, বৃক্ষের শরীর হইতেই ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বিগলিত হইয়া প্রথমে মূল দেশে সঞ্চিত হয়, পরে নানা পথে প্রবাহিত হইয়া দ্বীপের নিম্ন ভূমি সকলে সঙ্কলিত হয়। অনুসন্ধানদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, এক এক বৃক্ষ হইতে প্রতিরাত্রিতে অন্যূন ২০ হাজার

---

* আফ্রিকার পশ্চিমভাগে আট্‌লাণ্টিকসাগরে কানারি নামে যে কতকগুলি দ্বীপ প্রসিদ্ধ আছে, তাহারই একটির নাম ফেরো।

টন পরিমিত নীর নিঃসৃত হয়। দ্বীপের স্থানে স্থানে ঐ জাতীয় বৃক্ষ ছিল, তৎসমুদয়ের জলে প্রায় ৭৫ ক্রোশ পরিধির দ্বীপবাসী মনুষ্যের ও পশুপালের জীবনধারণ হইত। জ্যাকসন সাহেব লিখিয়াছেন, "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়াই প্রত্যয় জন্মিয়াছে, অন্যের মুখে শুনিলে কখনই এরূপ অদ্ভুতবিষয়ে বিশ্বাস করিতাম না।" এই কারণে ঐ দ্বীপকে পূর্ব্বকালে "প্লুবিয়ানিয়া" বলিত ;—প্লুবিয়ানিয়া শব্দের অর্থ "স্বর্গ হইতে জল প্রাপ্ত।" গিরিনির্ঝর হইতে যেরূপ বারি বিনির্গত হইয়া প্রবাহিত হয়, এই বৃক্ষ হইতেও সেইরূপ হইত বলিয়া উহার নাম নির্ঝরবৃক্ষ।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কালক্রমে দ্বীপনিবাসীরা যখন বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং সমুদ্রের লবণাম্বু শোধন করিয়া পান করিতে শিখিল, সেই অবধি নির্ঝর বৃক্ষের বারিনিঃসরণও রহিত হইয়া গেল। বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু যামিনীযোগে আর তাহা হইতে বারিবৃষ্টি হইত না। যত দিন প্রয়োজন ছিল, তত দিন বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে বারি নিঃসৃত হইত, যখন প্রয়োজন শেষ হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্রিয়াও রহিত হইল। যদি বারিবর্ষণ ঐ বৃক্ষের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই, প্রয়োজনের অভাব হইল বলিয়া তাহার সে প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অভাব হওয়ার কারণ কি? প্রয়োজন অপ্রয়োজন, ন্যায় অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, প্রকৃতি কার্য্য করেন, ইহা বলা যায় না; যেহেতু প্রকৃতি স্বয়ং অচেতন, তাহাতে বিবেচনাশক্তি কিরূপে সম্ভব হয়? প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রতিরোধ প্রাপ্ত না হইলে রহিত হইতে পারে না, কিন্তু সকল বৃক্ষগুলির বারিনিঃসরণ এককালে কি প্রতিরোধ পাইয়া রহিত হইল, তাহার কিছুই উপলব্ধি হয় না। এরূপ

ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে মনের কি ভাব হয়!—কেবল কি অচেতন প্রকৃতিদ্বারাই সংসার ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে? না, বাষ্পীয় শকটের পরিচালকের ন্যায় প্রকৃতি যন্ত্রেরও একজন জ্ঞানবন্ত পরিচালক আছেন! যদ্যপি কেহ কহেন প্রকৃতি অচেতন নহেন, প্রকৃতি প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝিয়াই কার্য্য করেন, তাঁহার উত্তরে আমরা কহিতেছি, তবেই তাঁহাকে ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইল,—কেবল নামান্তর মাত্র।

আশ্চর্য্য বৃষ্টি।

আয়র্লণ্ড রাজ্যের কার্‌লো ও কিল্‌কেনি নামক প্রদেশের চতুর্দ্দিকে প্রায় ২০০ ক্রোশ ব্যাপিয়া ১৮৪৯ খৃঃঅব্দের এপ্রিল মাসে একবার মসিবর্ষণ হইয়াছিল। ডবলিন নগরের রয়েল সোসাইটি নামক সভায় প্রোফেসর বার্করনামা পণ্ডিত তৎসম্বন্ধে কহিয়াছিলেন যে, প্রথমে মেঘোদয় হইয়া এরূপ গাঢ় অন্ধকার হয় যে, দিবাভাগে আলো জ্বালিয়া লেখা পড়া করিতে হইয়াছিল, তৎপরে শিলাবর্ষণ ও প্রখর বিদ্যুৎ আরম্ভ হয়, কিন্তু বিদ্যুতের সহিত বজ্রগর্জন ছিল না, ইহাও এক আশ্চর্য্যের বিষয়। শিলাবর্ষণ সমাপ্ত হইলে পর মসিবৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঐ বৃষ্টির জল দেখিতে অবিকল মসির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, এবং অতীব দুর্গন্ধ ও বিস্বাদু;—কোন পশুতেই সে জল পান করে নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল, ঐ জল বস্ত্রে লাগিলে বস্ত্রকে কৃষ্ণবর্ণে কলঙ্কিত করে। কোন পাত্রে রাখিলে অল্পকালের মধ্যে জল হইতে কৃষ্ণবর্ণ অণুনিকর পৃথক্ হইয়া পড়ে, তাহাতে জলের বর্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার দেখা যায়।

তদনন্তর ১৮৫০ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে ইংলণ্ডের নর্থহাম্পটন প্রদেশে আর একবার মসিবৃষ্টি হয় ;—তৎসম্বন্ধে রেভরেণ্ড ট্রীয়ন সাহেব কহেন, "প্রথমতঃ প্রাতে একবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তৎকালে মসিবৃষ্টি হয় নাই ; পরে অপরাহ্নে বেলা ৪ টার সময় একখণ্ড মেঘ উদয় হইয়া মসি-বর্ষণ করে। যাহারা বস্ত্র শুকাইতে দিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহাদিগের বস্ত্রগুলি মসিলিপ্ত হইয়া গেল। ঐ বৃষ্টির জল স্থানে স্থানে টবে ধৃত হইয়া ছিল, তাহাতে দৃষ্ট হইল, জলের উপরিভাগে ফেনপুঞ্জ সংগৃহীত হইয়াছে ; ঐ ফেনের বর্ণ সীসার ন্যায়। বৃষ্টির তিন দিবস পরে, আমার দুইজন ভৃত্য গাড়ীতে ঘাস বোঝাই করিয়া দিতে গিয়াছিল, তাহাদিগের উভয়েরই বস্ত্র কটিদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণে কলঙ্কিত হইয়াছিল।"

আয়র্লণ্ড রাজ্যের ডাওন নামক প্রদেশে ১৮৬২ খৃঃ অব্দের ২৬ এ মার্চ আর এক বার মসিবর্ষণ হয়। পূর্ব্বে কতিপয় দিবস হইতে আকাশ ভারাক্রান্ত ও প্রবল পূর্ব্ববায়ু প্রবহমাণ হইয়াছিল। তদনন্তর সন্ধ্যার পর হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রির অধিকাংশ কাল মসিবৃষ্টি হয়। প্রভাতে দৃষ্ট হইল, পয়ঃপ্রণালী ও নিম্নস্থান সমুদয় অসিত জলে পরিপূর্ণ, এবং মেষপ্রভৃতি যে সকল পশু বৃষ্টির সময়ে বাহিরে ছিল, তাহারা সকলেই মসিমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে প্রায় ৪ ক্রোশ ব্যাপিয়া এইরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু ঐ কৃষ্ণবর্ণ জলে কোন বিশেষ, স্বাদু বা উগ্র ঘ্রাণ ছিল না ; অথবা কোন প্রকারের সূক্ষ্ম অণুও তাহাতে লক্ষিত হয় নাই।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দে এক দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়, ওয়েল্‌স দেশ-বাসিনী কোন কামিনী একটি হ্রদের তটে বসিয়া ব্যবহার্য্য পাত্রাদি

ধৌত করিতেছিলেন, এমন সময়ে শূন্য হইতে বারিবর্ষণের ভাবে তাঁহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য মৎস্য নিপতিত হইতে লাগিল। কতকগুলি মৎস্য হ্রদের নীরে কতকগুলি তীরে নিপতিত হইল। ইংরাজেরা যাহাকে হেরিং বলেন, মৎস্যগুলির আকার সেই হেরিং মৎস্যের ন্যায়। মৎস্য পড়িবার পূর্ব্বে দিবাভাগে একবার অতিশয় বারিবর্ষণ হয়, এবং মৎস্য-পতনের পরবর্ত্তী দিবসেও অতিশয় বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়াছিল।

১৮৩০ খৃঃ অব্দের ৯ই মার্চ্চ রাত্রিভাগে ইংলণ্ডের আর্জিল সায়ের নামক প্রদেশে অতিশয় বারিবর্ষণ হয়, পর দিবস কৃষকেরা দেখিল, সকল শস্যক্ষেত্রই মৎস্যময়। অনেকগুলি মৎস্য বর্ষণের পর দিবস পর্য্যন্তও সজীব ছিল।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে, ফরাসি দেশে, এক দিবস পুঞ্জ পুঞ্জ পরিমাণে ভেক-শাবক বর্ষণ হইয়াছিল। ঐ সকল ভেকশিশুর পুচ্ছচিহ্ন তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ষণসময়ে বস্ত্র পাতিয়া অনেকে ঐ সকল ব্যাঙাচি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বহুব্যক্তি এই আশ্চর্য্য বর্ষণ বিবৃত করিয়া ফরাসি পণ্ডিতগণের সমাজে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৮২১ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ভায়েনা নগরে এক দিবস বারি বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার কীট পুঞ্জপুঞ্জ পরিমাণে নিপতিত হইয়াছিল। তদ্দেশবাসীরা তদাকার কীট পূর্ব্বে কখন দর্শন করেন নাই এবং যে সকল পণ্ডিতেরা কীটের বৃত্তান্ত সবিস্তর জানেন, তাঁহারাও দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই। কীটগুলির কলেবরে একপ্রকার কঠিন খোলা ছিল। কেবল পরীক্ষাদ্বারা এই মাত্র নিরূপিত হইয়াছিল যে, তাহারা নীরবাসী, তদ্ভিন্ন তাহারা কোন্ দেশ হইতে কিরূপে সমাগত হইল, তাহা কেহই বলিতে পারিলেন না।

কেহ কেহ কহেন, সূর্য্যকিরণে জলাশয় হইতে বাষ্পাকারে যে জল সমুত্থিত হয়, তাহার সহিত মৎস্য ও ভেকপ্রভৃতি জলজন্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণ্ডও উঠিয়া থাকে; মেঘমণ্ডলে ঐ সকল অণ্ড প্রস্ফুটিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃষ্টির সহিত ভূতলে নিপতিত হয়। অন্য পণ্ডিতেরা কহেন, মেঘের সংযোগে বায়ুর আকর্ষণে জলাশয় হইতে স্তম্ভাকারে স্থূল জলরাশি সমুত্থিত হইয়া যে জলস্তম্ভ হয়; সেই জলস্তম্ভের সহিত মৎস্য ও ভেক-প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজন্তুও বায়ুর আকর্ষণে শূন্যে আরোহণ করে এবং তাহারাই পুনর্ব্বার তথা হইতে নিপতিত হয়।

আমাদিগের পুরাণগ্রন্থে পুষ্প, চন্দন, পাংশু ও শোণিত বর্ষণের কথা পাঠ করিয়া আমরা মনে করিতাম, এ সকল হয় কবিদিগের কল্পনা, না হয় কেবল নির্ব্বোধ হিন্দুদিগের প্রলাপমাত্র। এক্ষণে মনে করি যে, আমরা নিজে মূর্খ বলিয়া, অনেক সময়ে, যাহারা স্বরূপতঃ মূর্খ নহে, তাহাদিগকেও মূর্খ বলিয়া থাকি।

মনুষ্যকৃত আশ্চর্য্য রচনা।

সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের এই মত যে, মনুষ্যে ঐশিক শক্তির অংশ আছে। ইহাতে এই আপত্তি উঠিতে পারে, তবে কি অন্যান্য প্রাণীতে ঐশিক শক্তির অংশ নাই?—স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সকল পদার্থ ও সকল প্রাণীতেই ঐশিক শক্তি বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা না থাকিলে তাহাদিগের ক্রিয়া কি রূপে নিষ্পন্ন হইতেছে? এরূপ অব-স্থায় মনুষ্যের সম্বন্ধে বিশেষরূপে ঐশিক শক্তির উল্লেখ করিবার প্রয়ো-জন কি? এই আপত্তির মীমাংসায় "ঐশিক শক্তি" পদের অর্থ কি, তাহা

বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। জীবনধারণের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের প্রয়োজন, সেই সকল কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত শক্তি প্রতি দেহে বিরাজিত রহিয়াছে ; সেই শক্তিকে এই নিমিত্ত ঐশিক শক্তি বলা যাইতে পারে যে, তাহা ঈশ্বরদত্ত, এবং শরীরের সহিত একযোগে উৎপন্ন, বৰ্দ্ধমান ও বিনষ্ট হয়। জীবনধারণের এই শক্তি বিশ্বব্যাপক ;—ধৰ্ম্মশাস্ত্রসমূহে মনুষ্যের যে ঐশিক শক্তির উল্লেখ হইয়াছে, বোধ হয় তাহা এ শক্তি নহে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, জীবনধারণের অতিরিক্ত অন্য কোন শক্তি মনুষ্যে আছে কি না ? অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যের শক্তির সীমাও কি অশন-বসন-আহরণ ও নিবাস-নিৰ্ম্মাণ পর্য্যন্ত ? মনুষ্যের সমুদয় শক্তি যদি কেবল দেহের অভাব পূরণেই পর্য্যবসিত হইত, তবে পৃথিবীর সকল মনুষ্যেরই এক ভাবাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সভ্য ও অসভ্য এই উভয় শ্রেণীর মনুষ্যই একজাতীয় প্রাণী, কিন্তু ইহাদিগের অবস্থাগত যাদৃশ প্রভেদ, আর কোন সমজাতীয় প্রাণীর মধ্যে তাদৃশ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না ; ঈদৃশ বৈষম্যের কারণ কি ? কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে, নরজাতি অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় প্রথমে অভাবপূরণার্থে ব্যগ্র হয় ;—অভাবপূরণ হইলে ভোগ বিলাসের নিমিত্ত প্রয়াস পায় ;—ভোগ বিলাসেও পরিতৃপ্ত না হইয়া পরে অনুসন্ধান করিতে থাকে, স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ সকল কি ? ইহারা কিরূপে উৎপন্ন হইল ? এবং কিরূপেই বা জীবিত রহিয়াছে ? ঈশ্বরের এই সকল কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাহাদিগের বিষয় কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে, তখন মনুষ্যের মনে বাসনা হয় যে, আমিও সৃষ্টি করি। মনুষ্য অতি দুৰ্ব্বল প্রাণী, কিন্তু তথাচ তাহার ঈদৃশ উচ্চ অভিলাষ নিতান্ত বিফল হয় না। নর ঈশ্বর

হইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকরণ করিতে পারে ;—সৃষ্টি করিতে পারে না, অন্ততঃ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয়। মনুষ্যজাতির এই বৃদ্ধিশীল বুদ্ধিবৃত্তি যে কত দূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না। অন্যান্য প্রাণীতে ঈদৃশ বর্দ্ধমান শক্তির ভাব লক্ষিত হয় না। মনুষ্যে ঈশ্বরের অনুকরণ করিবার এই যে শক্তি আছে, তাহাই ধর্ম্মশাস্ত্রে মনুষ্যের ঐশিক শক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান হয়। জীবনধারণ ও ভোগলালসা-তৃপ্তির সহিত যে সকল বস্তুর কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, মনুষ্য বিস্তর আয়াসে কখন কখন সে সকল বস্তুও নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। অপ্রয়োজনীয় অথচ অতীব আশ্চর্য্য সেই সকল রচনার কতিপয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আমরা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

স্থাবরজঙ্গম পদার্থের প্রতিমা, মনুষ্য অনায়াসেই নির্ম্মাণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে জীবন্ত ভাব প্রস্ফুটিত করিতে পারেন না। মনুষ্যনির্ম্মিত বিহঙ্গ উড়িতে পারে না,—কলনাদও করে না। ভাস্করবিরচিত পরম সুন্দরীর প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার স্মিত মুখের বাক্য শুনিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। নিজ রচনার এই সকল ত্রুটি পূরণ করিবার নিমিত্ত মনুষ্য বহুকাল হইতে প্রয়াস পাইতেছেন, এবং কেহ কেহ কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন, এরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়।

গ্রীশ রাজ্যের প্রধান পণ্ডিত প্লেটো ও আরিষ্টটল লিখিয়াছেন যে, ডিডালস্ নামক একব্যক্তি এরূপ কৌশলে কতকগুলি নরপুত্তলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা সর্ব্বদাই ধরাতলে পাদবিহার করিত। তাহাদিগকে স্থির রাখিতে হইলে বান্ধিয়া রাখিতে হইত।

লিখিত আছে, খৃষ্টাব্দের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে আর্কিটাস নামে এক জন শিল্পী একটি কপোত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ঐ কপোতটি স্বয়ং উড়িতে পারিত, কিন্তু উড়িয়া যেখানে যাইয়া বসিত, সেখান হইতে পুনর্ব্বার আর উড়িয়া আসিতে পারিত না।

খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীতে ইংলণ্ডরাজ্যে রজার বেকন নামে এক পণ্ডিত পিত্তলের দ্বারা একটি নরমুণ্ডের প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাহাতে এরূপ শিল্পচাতুরী ছিল যে, নির্ম্মিত হওয়ার কিছুকাল পরে ঐ মুণ্ডের বদন হইতে স্বতই তিনটি ইংরাজী বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল; সেই তিনটি বাক্যের অর্থ "সময় ছিল, সময় আছে, সময় অতীত হইল"। শ্রুত হওয়া যায়, এই তিনটি কথা কহিয়া মুণ্ডটি ধরাতলে নিপতিত হইয়া বিচূর্ণিত হইয়াছিল। এই পণ্ডিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র, আতসি গেলাস এবং বারুদের আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ইউরোপে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীতে আল্‌বর্‌ট্‌স ম্যাগ্‌নস নামে একজন পণ্ডিত জর্ম্যাণ রাজ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি পিত্তলদ্বারা একটি নরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে এত দূর সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার গৃহকর্ম্ম সমুদয় সম্পাদিত হইত। শুভগ্রহ-সংযোজনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ম্যাগ্‌নস বহুকাল পরিশ্রম করিয়া ঐ প্রতিমা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু যন্ত্রের কোন অজ্ঞাত ত্রুটিবশতঃ ঐ কৃত্রিম ভৃত্য সর্ব্বদাই অনেক কথা কহিত। টমাস একুইনাস নামে ঐ পণ্ডিতের এক ছাত্র ছিলেন, তিনি একদিন অতি নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করিতে করিতে ভৃত্যের বাগাড়ম্বরে বিরক্ত হইয়া রোষভরে লৌহদণ্ডের আঘাতে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন! ইহাতে ম্যাগ্‌নস ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিয়াছিলেন, 'আমার ৩০ বৎসরের পরিশ্রম নষ্ট হইল'!

জন্ মুলার নামে আর একজন বিচক্ষণ জর্ম্মাণ একটি বিহঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জর্ম্ম্যাণির সম্রাট্ ম্যাক্সিমিলিয়ন যখন নরেম্বার্গ নগরে আইসেন, তখন ঐ বিহঙ্গ আকাশ-পথে উড়িয়া নগরের বহির্ভাগে যাইয়া সম্রাটের প্রত্যুদ্গমন করে;—পরে অগ্রে উড়িয়া আসিয়া সম্রাটের আগমনের অপেক্ষায় নগরের তোরণোপরি উপবিষ্ট হয়; এবং তিনি আগত হইবামাত্র, তাঁহার মস্তকোপরি উড্ডীয়মান হইয়া সঙ্গে সঙ্গে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রুত হওয়া যায় যে, মুলার লৌহ-দ্বারা একটি মক্ষিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; ঐ মক্ষিকা তাঁহার হস্ত হইতে উড্ডীন হইয়া বহু দূর ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার হস্তোপরি আসিয়া উপবিষ্ট হইত।

১৬৮৮ খৃঃ অব্দে আমেরিকা খণ্ডের একটি অধিকার লইয়া ইংরাজ-দিগের সহিত ফরাসিগণের বিগ্রহ ঘটনা হয়। সে সময়ে জেনারল ডিজিনিস নামে এক ব্যক্তি ফরাসি পক্ষের সেনানায়ক ছিলেন। ঐ সেনানায়ক এরূপ কৌশলে একটি ময়ূর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, সেটি জীবন্ত ময়ূরের ন্যায় ধরাতলে পাদবিহার করিত, ভূমি হইতে নিক্ষিপ্ত বীজকণা তুলিয়া ভক্ষণ করিত এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ ভুক্তবীজ তাহার উদরে পরিপাক প্রাপ্ত হইত।

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে বুকন্‌সন নামে আর একজন ফরাসি একটি হংস নির্ম্মাণ করিয়া পারিস নগরে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। তাহার আয়তন স্বাভাবিক হংসের সদৃশ ছিল। কলেবরের উপরিভাগ পক্ষাবলীর দ্বারা আবৃত এবং পঞ্জরাস্থিগুলি অবিকল স্বভাবের শৃঙ্খলায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ কৃত্রিম হংসকে একবার গতিসংযুক্ত করিলে সকল বিষয়েই সে হংসের ন্যায় আচরণ করিত;—পক্ষসঞ্চালন করিত,—আহার আহরণ

করিয়া তাহা গলাধঃকরণ করিত,—আহার পরিপাক করিত,—হংসের ন্যায় ধ্বনি করিত—এবং জীবন্ত হংসে যেরূপ করে, চঞ্চুপুটদ্বারা সেইরূপ জলশোষণ করিত।

বুকন্‌সন আর একটি বেণুবাদক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ পুত্তলী ফুৎকারযোগে বেণুযন্ত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সুচারুরূপে ১২টি গৎ বাজাইতে পারিত। ঐ শিল্পী আরও অনেকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সকল আশ্চর্য্য রচনা ইউরোপের সকল রাজ্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল, পরে তৎসমুদয় রুস রাজ্যের রাজা ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বেক্‌ম্যান নামক একজন ইংরাজ রুস রাজ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়া ঐ সকল শিল্পরচনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তখনও সে সকলের শিল্পচাতুরী বিনষ্ট হয় নাই, কেবল মাত্র জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

লণ্ডন নগরে দুইটি নারীপ্রতিমা প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহারাও অতি বিচিত্র সুরে বংশী বাদন করিত। বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত ফরাসি শিল্পীর অনুকরণে ঐ দুইটি পুত্তলী বিরচিত হইয়াছিল।

দুইটি বাদ্যযন্ত্র সমান সুরে বান্ধিয়া একটিতে আঘাত করিলে অপরটি হইতেও সুর কণিত হয়। সমস্বরের ঈদৃশ প্রাকৃতিক ঘনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আনেকস নামে গণিতবিদ্যা-বিশারদ এক ব্যক্তি একটি নরকঙ্কালের প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কঙ্কালটির হস্তে গিটার নামক একটি বাদ্যযন্ত্র ছিল, গিটার বাজাইবার সময়ে যেরূপে অঙ্গুলি পরিচালিত করিতে হয়, কঙ্কালের অঙ্গুলিগুলি যন্ত্রের গুণে সেই রূপে নড়িতে থাকিত। আরএকটি গিটার কঙ্কালের করস্থ গিটারের সহিত সমান সুরে বান্ধিয়া অন্তরাল হইতে আনেকস স্বয়ং বাজাইতেন,

তাহাতে স্বরসমতার ধর্ম্মবশতঃ কঙ্কালের করের গিটারও বাদ্যমান হইত। লোকের ভ্রম হইত যে, নির্জীব-নর-কঙ্কালই গিটার বাজাইতেছে। এই রচনা করিয়া শিল্পীকে অতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। কঙ্কালকে গিটার বাজাইতে দেখিয়া নগরবাসীরা যাদুকর অপবাদ দিয়া তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করে, এবং বিচারে আদেশ হইয়াছিল যে, কঙ্কাল সহ আনেকসকে অনলে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করা হয়। অজ্ঞ বিচারকের ঈদৃশ কঠিন আদেশ কার্য্যতঃ পালন করা হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। মূর্খের অসাধ্য কার্য্য নাই!

প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল, কেম্পলন নামে ইঙ্গেরিদেশীয় এক ব্যক্তি একটি নরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পিয়ানো নামক ইংরাজী বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র ঐ মূর্ত্তির শরীরের সহিত সংযুক্ত ছিল। যেরূপে পিয়ানো বাজাইতে হয়, কেম্পলন অবিকল সেই প্রণালীতে ঐ যন্ত্রে ইতস্ততঃ অঙ্গুলির আঘাত করিতেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুত্তলীর বদন হইতে বাক্য বিনির্গত হইত। মূর্ত্তিটির স্বর কর্ণে কিঞ্চিৎ কর্কশ বোধ হইত, কিন্তু দীর্ঘ বাক্য ও পদগুলি উহা অতি দ্রুত উচ্চারণ করিতে পারিত, এবং যাহা উচ্চারণ করিত, তাহা স্পষ্টরূপে সকলেরই উপলব্ধি হইত। কেবল ড গ ক ট এই কয়েকটি বর্ণ উত্তম রূপে উচ্চারণ করিতে পারিত না। এই আশ্চর্য্য রচনা প্রকাশ্য স্থানে সাধারণ-গোচরে পরিদর্শিত হইয়াছিল। কেম্পলন দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া ঐ নরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ফরাসি দেশের রাজা চতুর্দ্দশ লুই যখন বালক ছিলেন, তখন তাঁহার ক্রীড়ার নিমিত্ত কেম্‌স নামা জনৈক পণ্ডিত একখানি ক্ষুদ্র আয়তনের গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গাড়ীখানিতে দুইটি কৃত্রিম অশ্ব সংযোজিত

ছিল, এবং তাহার বহির্ভাগে একজন কোচম্যান, একজন সহিস এবং একজন হরকরা নিজ নিজ স্থানে উপবিষ্ট এবং গাড়ীর অভ্যন্তরে একটি রমণীর মূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট ছিল। মেজের প্রান্তভাগে গাড়ীখানি রাখিবামাত্র, কোচম্যান করস্থ চাবুক তুলিয়া অশ্বের অঙ্গে আঘাত করিত, অশ্বদ্বয় অমনি প্রকৃত অশ্বের ন্যায় পদসঞ্চালন করিয়া ধাবমান হইত। এইরূপে গাড়ীখানি মেজের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া আপনা হইতেই প্রত্যাবর্ত্তিত হইত, এবং যেখানে শিশু-রাজা উপবিষ্ট থাকিতেন, সেইখানে আসিয়া স্থির হইত। অমনি সহিস ও হরকরা অবরোহণ করিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিত এবং গাড়ীর অভ্যন্তরভাগের মহিলা ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সবিনয়ে নমস্কার করিয়া রাজার হস্তে একখানি আবেদনপত্র প্রদান করিতেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার রাজাকে নমস্কার করিয়া রমণী গাড়ীতে আরোহণ করিতেন, হরকরা গাড়ীর দ্বারবন্ধ করিয়া দিয়া আপনার স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইত এবং কোচম্যান পুনর্ব্বার কশাঘাত করিলে হয়দ্বয় ধাবমান হইত;—হতভাগ্য সহিস কিয়ৎক্ষণ গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পরে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আপনার স্থানে যাইয়া উপবেশন করিত।

মনুষ্যের এই সকল রচনা তাঁহার জীবনধারণের নিমিত্ত আবশ্যক হয় না;—এসকল রচনায় তাঁহার ভোগলালসারও তৃপ্তিসাধন হয় না; বরঞ্চ ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া একাগ্রমনে বিস্তর যত্ন করিলে, তবে মনুষ্য এ সমস্ত রচনায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সাংসারিকের চক্ষে দেখিলে এ সকলকে অকর্ম্মণ্য খেলামাত্র বলিতে হয়, কিন্তু ভাবুকের চক্ষে এ খেলা ঈশ্বরের খেলার অনুকরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ সকল আশ্চর্য্য রচনার বিবরণ জ্ঞাত হইলে অন্তরে স্বতই এই ভাবের উদয় হয়,

হে মানব! তোমা হইতে আরও কি অসাধ্য সাধন হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। তোমার শক্তির সীমা তুমি জান না বলিয়াই অলীক বিষয়ে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছ!

নরনাড়ীর আশ্চর্য্য গতি।

নরবুদ্ধির কি আশ্চর্য্য মহিমা! তাহা হইতে কত প্রকার আশ্চর্য্য বস্তুই সমুৎপন্ন হইয়াছে! উদাহরণার্থে আমরা এস্থলে ঘটীযন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি। ঘটীযন্ত্র জীবন্ত বস্তু নহে, অথচ ইহার অভ্যন্তরভাগ জীবন্ত শরীরের অভ্যন্তরের ন্যায় সর্ব্বদাই ক্রিয়াবান্;—নানাস্থানে নানাপ্রকার চক্র ও ধাতুসূত্র আন্দোলিত হইতেছে,—টিক্ টিক্ শব্দ অবিরামে কর্ণগোচর হইতেছে এবং তদ্দ্বারা কালের অলক্ষ্য গতি কি সুচারু নিয়মে নিরূপিত হইতেছে! কিন্তু মনুষ্যের রচনা-কৌশল যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, ঈশ্বরের রচনা-কৌশলের অনুকরণ ভিন্ন নহে। মনুষ্যের নাড়ীযন্ত্রের সহিত ঘটীযন্ত্রের যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে, তাহা নিম্নে বিবৃত করা হইল;—পাঠকগণ বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন যে, মনুষ্যের সমুদয় রচনা ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলের আবিষ্কার হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ সুচতুর, শিল্পীর কৌশল বোধায়ত্ত করিতে যাঁহার শক্তি আছে, সেই নর মহাশয়ও অসংখ্য ধন্যবাদভাজন।

শরীরতত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসকগণ কহেন, সুস্থ নরশরীরে মণিবন্ধভাগের নাড়ী এক মিনিটে ৬০ বার * স্পন্দিত হয়; ঐ ৬০ বারের প্রতিস্পন্দনে

---

* প্রতিমিনিটে নাড়ীর গতি, সাধারণতঃ, ৬৫ হইতে ৭৫ পর্য্যন্ত ধরা হয়; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে ষাটিও দেখা যায়।—অধিকন্তু, প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তি নির্ণয় করাও তাদৃশ সহজ নহে;—এবং দেশকালপাত্রভেদে নাড়ীগতির তারতম্যেরই বা বিচিত্র কি?

এক সেকেণ্ড সময় পর্য্যাপ্ত হয়, সুতরাং ঐ স্পন্দন ও ঘটীযন্ত্রের সেকেণ্ড, উভয়ের দ্বারাই তুল্য পরিমিত সময়ের ব্যবচ্ছেদ হয়। এবিষয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন বটে, কিন্তু একটি সামান্য কৌশল অবলম্বন করিলে যে, নাড়ীর গতি হইতে মিনিট ও ঘণ্টার সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এ কথা সাধারণের জ্ঞাতসার থাকা সম্ভব নহে। সেই কৌশলটি এই :— ১০ বা ১২ ইঞ্চ লম্বা এক গাছি সূত্রের এক প্রান্তে একটি বোতাম বান্ধিয়া ঐ সূত্রের অপর প্রান্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরিভাগে (যে স্থানে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয় তথায়) স্পর্শ করিয়া রাখিতে হইবে; পরে তর্জ্জনীর দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ এরূপে অবনত করিয়া ধরিতে হইবে যে, ঐ সূত্র নখস্পর্শ না করিয়া অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বগ্রন্থি হইতে বোতামের সহিত অবাধে প্রলম্বিত থাকিতে পারে। ঐ লম্বমান বোতাম একটি মধ্যমাকার গেলাসের গর্ভে ঝুলাইয়া রাখা আবশ্যক;—অর্থাৎ সূত্রের এক প্রান্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নাড়ীস্পন্দনের স্থান স্পর্শ করিয়া রহিল, অপর প্রান্ত বোতামের ভারে গেলাসের গর্ভে বিলম্বিত হইয়া থাকিল। এইরূপে সূত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তের কম্পন নিবারণার্থে বাম হস্তের দ্বারা তাহার ভার ধারণ করত সুস্থির হইয়া উপবেশন করিতে হইবে। তদনন্তর তিন মিনিটের মধ্যেই প্রলম্বিত বোতামটি দুলিতে আরম্ভ করিবে, এবং অনতিপরেই যে কয়েক ঘটিকা সময় অতীত হইয়াছে, গেলাসের কলেবরে বোতামের সেই কয়েকটি আঘাত হইবে। আঘাত কয়েকটি সমাপ্ত হইলেই বোতামের আন্দোলন আপনা হইতেই মন্দীভূত হইয়া পড়িবে, কিন্তু কিঞ্চিৎকাল পরেই, যে কয়েক মিনিট সময় অতীত হইয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ মন্দ নাদে গেলাসের শরীরে পুনর্ব্বার বোতামের সেই কয়েকটি আঘাত হইবে। তদনন্তর বোতামের বেগ আপনা হইতেই শিথিল

হইয়া পড়িবে। যত মিনিট সময় গত হইল, এইরূপে প্রতি পঞ্চম মিনিটে গেলাসের শরীরে ততগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাত হইতে থাকিবে। পরে ঘটিকা পূর্ণ হইলে ঘটিকার যত সংখ্যা, অপেক্ষাকৃত সবলে গেলাসের গাত্রে ততগুলি আঘাত হইবে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঘণ্টা ঘোষণার আঘাত একাদিক্রমে ১২ পর্য্যন্ত হইয়া অবিকল ঘটীযন্ত্রের ন্যায় ১৩র পরিবর্ত্তে পুনর্ব্বার এক হইতে আরম্ভ হয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নাড়ীস্পন্দনের প্রণালীই ঈদৃশ আঘাতের একমাত্র কারণ; সূত্রযোগে ঐ স্পন্দনের বেগ বোতামে সঞ্চারিত হইয়া মিনিট ও ঘণ্টার মৃদু ও সবল আঘাত প্রকটিত করে।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, স্বয়ং-বাদ্যমান ঘটীযন্ত্র নাড়ীস্পন্দনের এই ক্রিয়া দেখিয়াই প্রথমে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথম প্রমাণ এই, দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা পরিমিত;—কিন্তু ঘটীযন্ত্র একাদিক্রমে ২৪ আঘাতের কৌশলে বিরচিত না হওয়ার কারণ কি? দ্বাদশের পরেই একের আরম্ভ, নাড়ীর গতির অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই অনুভব হয় না। বিশেষতঃ নাড়ীদ্বারা প্রতি পঞ্চম মিনিটে, মিনিটের গতি প্রকটিত হয়, ঘটীযন্ত্রেও মিনিটের সংখ্যা তদ্রূপ প্রতি পঞ্চম মিনিটে বিভক্ত আছে। ঈদৃশ সাদৃশ্য কখনই অকস্মাৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। যিনি ঘটীযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই অগ্রে নাড়ীস্পন্দনের রহস্য জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বিখ্যাত মুসলমান বাদসাহ হারুন্-অল্-রসিদ ফরাসি সম্রাট্ সার্ল্‌মেনকে উপহার প্রেরণ করেন। ঐ উপহার-দ্রব্যের মধ্যে একটি শিক্ষিত হস্তী ও একটি স্বয়ংবাদ্যমান ঘটীযন্ত্র ছিল। ঐ দুই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দেখিবার জন্য ফরাসি রাজ্যে বিপুল জনতা হইয়াছিল।

সংস্কৃত কোন গ্রন্থেও স্বয়ং-বাদ্যমান ঘটীযন্ত্রের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং প্রাচীন ভারতীয়েরাও যে, এ যন্ত্রের বিষয় জানিতেন, এরূপ উপলব্ধি হয় না। এতদ্দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয় যে, মুসলমানেরাই স্বয়ং-বাদ্যমান ঘটীযন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। নাড়ী-জ্ঞান-বিষয়ে মুসলমানেরা বিশেষ পটু হইয়াছিল, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। নবাব-অঙ্গনাগণকে অপর পুরুষে স্পর্শ করিতে পারিত না, তাঁহাদিগের পীড়া হইলে মুসলমান হকিমেরা সূত্র-সংযোগে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, এ প্রবাদ আমাদের দেশে অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। নাড়ীজ্ঞান-বিষয়ে মুসলমানেরা বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিল, এবং তাহারাই স্বয়ং-বাদ্যমান ঘটীযন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইহাদ্বারাও নাড়ীপরীক্ষা হইতে ঘটীযন্ত্রের উৎপত্তির পোষকতা হয়।

যদি নাড়ীপরীক্ষা হইতে ঘটীযন্ত্র সৃষ্টি হওয়ার অনুমান সত্য হয়, তবে ইউরোপ কখনই তাহার জন্মভূমি নহে; যেহেতু ইউরোপীয়েরা অদ্যাবধি নাড়ীরহস্য সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। ডাক্তারেরা নাড়ীর গতির দ্রুত ও মন্দভাব উপলব্ধি করিতে পারেন মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় অনেক কবিরাজ সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, এক বৎসর পূর্ব্বে, তাহার মৃত্যুর কাল অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়।* দেশীয় চিকিৎসার

---

* দেশীয় কোন কোন চিকিৎসক সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যুর সময় অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, এরূপ প্রবাদও শুনিতে পাওয়া যায়। বিশ্বস্ত প্রমাণের অভাবে এস্থলে সে সকল প্রবাদের উল্লেখ করা উচিত বোধ করিলাম না। কিন্তু নাড়ীপরীক্ষাবিষয়ে আমরা স্বয়ং যে আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, নিম্নে তাহাই বিবৃত করিতেছি। বাখরগঞ্জ জেলার অধীন বারুতি নামে একখানি গ্রাম আছে, তথায় ভৈরব শীল নামে একজন চিকিৎসক আছেন। তিনি জাতিতে নাপিত, কিন্তু

ইদানীন্তন অত্যন্ত পতনের অবস্থাতেও নাড়ীজ্ঞান-বিষয়ে অনেক কবি-রাজকে ডাক্তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেখা যায়।* প্রাচীন পীড়িত ব্যক্তিকে কোন্ সময়ে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়ার আবশ্যক, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে এক্ষণপর্য্যন্তও কবিরাজের আবশ্যক হয়। যাঁহারা ডাক্তারদিগের নিতান্ত অনুরাগী, তাঁহারাও এবিষয়ে হতভাগ্য কবি-রাজকে আহ্বান করিয়া থাকেন। "২৪ ঘণ্টা মধ্যে রোগীর জীবনান্ত

পুরুষানুক্রমে তাঁহাদিগের বংশে বৈদ্যের ব্যবসায় প্রচলিত আছে। তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, যে কোন ব্যক্তিই হউক, তাহার আজন্ম কালের মধ্যে যখন যখন যে কোন পীড়া হইয়াছিল, একে একে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিতে পারেন। শরীরের অতি গুপ্ত স্থানে ব্রণ বা ক্ষতচিহ্ন যে কয়েকটি আছে, তাহাও ব্যক্ত করিয়া থাকেন। পরীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার একটি উক্তিও অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রস্তাবসংকলনকর্ত্তার ও তাঁহার কতিপয় আত্মীয়ের নাড়ী ঐ চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি যখন প্রত্যেকের আজন্ম কালের রোগের ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিলেন, তখন আমাদিগের বিস্ময়ের আর পার রহিল না। তিনি বিদেশে যাইয়া চিকিৎসা করেন না। দীর্ঘকাল জটিল রোগ ভোগ করিয়া আরোগ্যবিষয়ে হতাশ হইয়া বহু ব্যক্তি বহুদূর হইতে তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া থাকেন। ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় কিছুমাত্র উপকৃত হয়েন নাই, এরূপ অনেক রোগী ৩।৪ দিবসের মধ্যে তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে। যাঁহারা কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই, চিকিৎসক তাঁহাদিগকে স্পষ্টই তদ্‌বিষয় এবং মৃত্যুর নিশ্চিত দিন ও ঘটিকা বলিয়া দিয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার বাক্য কখনই ব্যর্থ হয় না।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক কহেন, কেবল নাড়ী-জ্ঞান হইতে এতদূর হইতে পারে না, পিশাচ-সিদ্ধি ইত্যাদির স্থায় ঐ ব্যক্তির কোন দৈব ক্ষমতা থাকিতে পারে। যে কোন রূপেই হউক, চিকিৎসা-বিষয়ে এই ব্যক্তির অসামান্য ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুত হওয়া যায়, তাঁহাদিগের বংশে পুরুষানুক্রমে এক ব্যক্তিতে ঐরূপ ক্ষমতার সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি এক্ষণে জীবিত আছেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

হইবে”—ডাক্তার এরূপ বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ২৪ দিন পর্য্যন্ত রোগী জীবিত রহিয়াছে, অথবা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এরূপও শ্রুত হওয়া গিয়াছে। রোগী তিক্ত কুইনাইনসেবনে বিরক্ত হইয়া সংগোপনে পরলোক গমন করিয়াছে, ডাক্তার তাহার নাড়ীপরীক্ষা করণান্তে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিতে বসিয়াছেন!—অনেক স্থানে এরূপ ব্যাপারও ঘটিয়াছে; কিন্তু তথাচ ডাক্তারেরাই প্রধান চিকিৎসক। যখন ডাক্তার ছিল না, তখন না জানি কিরূপে এদেশের অসভ্য লোকেরা জীবনরক্ষা করিত! ঈশ্বর না করুন, যদি ভবিষ্যতে ডাক্তার না থাকে, তবে সভ্য দেশীয়গণের প্রাণরক্ষার কি উপায় হইবে!

সিন্ধুধূলি।

সময়ে সময়ে সমুদ্রে ধূলিবৃষ্টি হইয়া থাকে, এ কথায় আশু কাহারও প্রত্যয় জন্মিতে পারে না। যেহেতু যে স্থান হইতে ভূভাগ বহুদূরে রহিয়াছে, সে স্থানে ধূলিসঞ্চার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু প্রকৃতি কি কৌশলে কোথায় কোন্ কার্য্য সম্পাদন করেন, তৎ সমুদয় কেহই বলিতে পারেন না;—তাঁহার রহস্যের পার অদ্যাবধি কেহই প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। ইন্দ্রজালীর ক্রিয়া এবং প্রকৃতির ক্রিয়া একই প্রকারের;—আমরা বিস্মিত হইয়া উভয়েরই ক্রিয়া নিরীক্ষণ করি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না। ইন্দ্রজালীর সহিত প্রকৃতির উপমা কেবল অগত্যা অবলম্বিত হইল মাত্র;—স্বরূপতঃ ইন্দ্রজালীর খেলা অপেক্ষা প্রকৃতির খেলা সমধিক বিস্ময়কর। চেষ্টা করিলে ইন্দ্রজালীর কৌশল বুঝিতে ও শিখিতে পারা যায়, কিন্তু প্রকৃতির চাতুরী ধরিবার বা শিখিবার উপায়

নাই। মনুষ্যের বুদ্ধি যতই অগ্রসর হউক্ না কেন, শরীরের সম্মুখবর্ত্তী ছায়ার ন্যায় প্রকৃতির জটিলতা অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতে থাকে।

সমুদ্রে ধূলিবর্ষণের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না সত্য, কিন্তু বহু ব্যক্তি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সুতরাং তাহাতে অবিশ্বাসও করা যায় না। তাঁহারা কহেন, প্রথমতঃ আকাশমণ্ডল যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়, তদনন্তর শূন্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা-নিকর অবিরাম নিপতিত হইতে থাকে। দগ্ধমৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে যেরূপ হয়, সিন্ধু-ধূলির আকার ও বর্ণও সেইরূপ। তৎকালে পাটল-বর্ণ ধূলিপটলে সাগর-শরীরের অপূর্ব্ব শোভা হয়, এবং বর্ষণসীমার মধ্যে জাহাজ উপস্থিত থাকিলে তাহারও রূপান্তর ঘটনা হয়। জাহাজের সর্ব্বাঙ্গ এবং তত্রত্য মনুষ্য ও দ্রব্য সমস্তই পাটলিমায় সুরঞ্জিত হয়। চতুর্দ্দিকে কোথাও মৃত্তিকার সংস্রব নাই,—আকাশ ও জল ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হয় না;—প্রবল বাত্যাও নাই যে, তদ্দারা দূর হইতে ধূলিপুঞ্জ প্রবাহিত হওয়া অনুমিত হইবে;—কোন দিকে কোন হেতু লক্ষিত হয় না, অথচ ধীরে ধীরে অবিরামে সূক্ষ্ম অণুপুঞ্জ নিপতিত হইতে থাকে! কখন কখন এরূপ হয় যে, একবার ধূলিবৃষ্টি হইয়া কিয়ৎক্ষণ ক্ষান্ত থাকে;—পরে পুনর্ব্বার বর্ষণ আরম্ভ হয়। ইংরাজী ১৭১৯ খৃঃ অব্দের ৬ই আপ্রিলে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে ক্রমান্বয়ে ১৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত ধূলিবর্ষণ হইয়াছিল।

আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর, মেডিটরেনিয়ান সমুদ্র, আফ্রিকার উত্তর-দিকের সমুদ্র, এবং কেপডিভারডী নামক দ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে সময়ে সময়ে এইরূপ ধূলিবর্ষণ হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ পর্য্যটক হম্বোল্ট সাহেব আমেরিকায় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, তথাকার শুষ্ক নদীগর্ত্ত এবং বালুময় ভূমি, অত্যন্ত রৌদ্রে উত্তপ্ত হইলে

প্রবল শব্দ সহ বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে বিপরীতদিকের বায়ুর প্রবাহ তথায় সম্মিলিত হইলে অতি আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হয়। পরস্পর প্রতিকূল বায়ুর প্রতিঘাত-বশতঃ বিদীর্ণ ভূমিগর্ত্ত হইতে বালুপুঞ্জ (জল-স্তম্ভের ন্যায়) স্তম্ভাকারে প্রবলবেগে শূন্যে সমুত্থিত হইতে থাকে;—আকাশমণ্ডল ঘোর ও সূর্য্যের প্রভা মন্দীভূত হয়, চতুর্দ্দিকের পদার্থ সমস্ত সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং তৎকালে নিকটবর্ত্তী স্থানে গ্রীষ্মও নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে।

কেহ কেহ বলেন, সিন্ধুধূলির সহিত এই বালুস্তম্ভের কোন সংস্রব থাকিতে পারে। সংস্রব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু স্বরূপতঃ কোন সংস্রব আছে কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে কেহই নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

অগ্নি-অস্ত্র।

দুই ব্যক্তি যদি এক সময়ে এক বস্তুর অভিলাষী হয়েন, তবে তাঁহাদিগের মধ্যে বিরোধ-বিগ্রহ ঘটনা হইয়া থাকে। এক পক্ষে দেখা যায়, পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত মনুষ্যের প্রয়োজন পূরণ হয় না, অন্য পক্ষে এক ব্যক্তির প্রয়োজন যে, অন্যের প্রয়োজনের প্রতিবন্ধক হয়, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। পরস্পর ঈদৃশ জটিল সম্বন্ধ থাকাতেই মনুষ্য একাকী বাস করিতে পারে না, অথচ একস্থানে বহু ব্যক্তি বাস করিলেই কলহের সঞ্চার হয়। নিষ্কণ্টক মৈত্রীভাব মনুষ্যমণ্ডলীতে কোন মতেই সম্ভাবিত হয় না। দেশের ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, নরসমাজ হইতে বিরোধ তিরোহিত হইবার নহে।

নরপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টি হওয়ার পরে সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ মনুষ্যের মধ্যে বিগ্রহ ব্যাপারের সঞ্চার হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় বোধ হয়, বিগ্রহ ব্যাপারের অধিক উপকরণ ছিল না;— করপদতাড়না এবং কাষ্ঠদণ্ড বা পাষাণখণ্ডের প্রহারের দ্বারাই যুদ্ধব্যাপার নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি কেবল শারীরিক শক্তির দ্বারা অপেক্ষাকৃত বলবান্ শত্রুকে পরাভূত করিতে পারে না দেখিয়া, তাহার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় মনুষ্যের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হইতে ক্রমে ক্রমে তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমস্ত সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। শত্রুর তীক্ষ্ণ প্রহরণ হইতে কিরূপে শরীর রক্ষা করা যাইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারও কৌশল আবিষ্কৃত হইল। এইরূপে এক পক্ষে প্রহারের বিবিধপ্রকার অস্ত্রাদি, অন্য পক্ষে রক্ষার নানারূপ শস্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে উদ্ভাবিত হইয়া আসিতেছে। খরশাণ বাণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কলেবরে কবচ আরোপিত হইল, তীব্রধার তরবার প্রহার পরিহারার্থে চর্ম্ম বিরচিত হইল। রক্ষার উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় এক একটি প্রহারাস্ত্র যেমন অকর্ম্মণ্য হয়, বুদ্ধিমানেরা অমনি তদপেক্ষা তীব্রতর আয়ুধের আবিষ্কার করেন। এইরূপে পৃথিবীতে যে কতপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কালক্রমে সে সকল অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে অনেকগুলির ব্যবহার এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। আমাদিগের মহাভারত, রামায়ণপ্রভৃতি গ্রন্থে, শেল, শূল, তোমর, প্রাস, ভিন্দিপালপ্রভৃতি অনেক অস্ত্রের নামমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগের কিরূপ আকার ছিল এবং কিরূপেই বা সেই সকল অস্ত্র প্রয়োগ করা হইত, তাহার কিছুই এক্ষণে বোধগম্য হয় না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও যে সকল অস্ত্রের ব্যবহার ছিল, বারুদের আবিষ্কার

হওয়ায় তাহারও অনেকগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যিনি বারুদের আবিষ্কার করেন, তিনি কি মহাশয় ব্যক্তি!—নিধনসাধনের এমন উপকরণ আর নাই। নিবিড় ঘনঘটাকার ধূমপটলে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া কামান-রাজীর ব্যাদিত বদন হইতে ভীম গর্জ্জনে যখন অসংখ্য অগ্নিপিণ্ড এককালে উদ্গীরিত হইতে থাকে, তখন তাহার নিকট আর কোন অস্ত্রশস্ত্রেরই প্রভাব প্রতীয়মান হয় না। তখন রণক্ষেত্রের যে কিরূপ শোভা হয়, তাহা বীর পুরুষেরাই অনুভব করিতে পারেন। চর্ম্মবর্ম্মপ্রভৃতি অঙ্গরক্ষার উপকরণ, অথবা পাষাণপ্রাচীরের দুর্গ, কামানের কাছে কাহারই কিছুতেই রক্ষা নাই। বারুদ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও কিন্তু একপ্রকার অগ্ন্যস্ত্রের ব্যবহার থাকার সমাচার জ্ঞাত হওয়া যায়, এক্ষণে তাহার সবিস্তার বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই; যথাকথঞ্চিৎ বিবরণ যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত করা হইল।

কথিত আছে, ঐ অগ্নি-অস্ত্র সিরিয়া প্রদেশের একজন মুসলমান আবিষ্কার করেন। তিনি খলিফা উপাধিধারী মুসলমান সম্রাটের ভৃত্য ছিলেন, পরে কোন কারণবশতঃ পূর্ব্বপ্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া কুস্তুনতুনিয়ার সম্রাটের নিকটে সমাগত হইয়া তাঁহার সেনাভুক্ত হয়েন। তৎকালে ইউরোপের উত্তরখণ্ডবাসী অসভ্য লোকেরা আসিয়া মধ্যে মধ্যে কুস্তুনতুনিয়া নগর আক্রমণ করিত, তাহাতে সম্রাট্‌কে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। ঈদৃশ অবস্থায়, পূর্ব্বোক্ত মুসলমানকে প্রাপ্ত হইয়া সম্রাটের বিশেষ উপকার হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহার রচিত অগ্নি-অস্ত্রের বলে অসভ্যগণের আক্রমণ হইতে কুস্তুনতুনিয়া নগর দুইবার রক্ষা পায়। এরূপ মহোপকারজনক বিষয়ের কৌশল সাধারণের জ্ঞাতসার হয় নাই, কেবল কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিই তাহার রচনা ও

প্রয়োগ বিষয়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, অসভ্যগণের হস্ত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার অভিপ্রায়ে একজন দেবদূতের দ্বারা ঈশ্বর এই অগ্ন্যস্ত্রের উপদেশ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইহার কৌশল জ্ঞাত হইয়া বিদেশীয় কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবে, ইহলোকে সম্রাট্ তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন, পরলোকে ঈশ্বরও তাহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিবেন। কোন কোন গ্রন্থে ঐ অস্ত্রের এইরূপ বর্ণনা পাঠ করা যায়;—বজ্রতুল্য ভীষণ গর্জন ও ধূমপটলসহ আকাশপথে উড্ডীন হইয়া অগ্নিময় সর্পাকারে ঐ অস্ত্র বিদ্যুদ্‌বেগে আসিয়া শত্রুসেনামধ্যে নিপতিত হইত। ইহার অগ্নি এরূপ প্রচণ্ড ভাবাপন্ন যে, জলে নির্ব্বাপিত হইত না। তাম্রনির্ম্মিত নলযন্ত্রের মধ্য দিয়া এই অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত;—জলযুদ্ধে ব্যবহার করিবার জন্য রণতরীর পার্শ্বদেশে ইহার যন্ত্র সকল নিবদ্ধ থাকিত;—ঐ সকল যন্ত্র নানাপ্রকার দৈত্যদানবের আকারে বিনির্ম্মিত হইত;—দুর্গরক্ষা করিতে হইলে দুর্গের উপরিভাগে ইহার ক্ষেপণের যন্ত্র সংস্থাপন করা হইত। কেহ কেহ বলেন যে, পিচের ন্যায় একপ্রকার জ্বলনশীল পদার্থ আছে, ইংরাজী ভাষায় তাহাকে নাপ্‌থা বলে। নাপ্‌থা, গন্ধক এবং একপ্রকার উদ্ভিদের নির্যাসসংযোগে ঐ অগ্ন্যস্ত্রের উপকরণ বিনির্ম্মিত হইত। সেই উপকরণে পাট আর্দ্র করিয়া ভল্লাস্ত্রের অগ্রভাগে বান্ধিয়াও কখন কখন তদ্দ্বারা যুদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন করা হইত। অতি নির্ভীক সেনাও এই অস্ত্রের বেগ সহ্য করিতে পারিত না। বিকটাকার অগ্নিময় এই অস্ত্রের আবির্ভাবমাত্র হয়, হস্তী, মনুষ্য সকলেই পলায়ন করিত। এবং রণতরীতে পতিত হইলে তাহাও ভস্মীভূত হইয়া যাইত। এরূপ ভীষণ প্রহরণ পূর্ব্বে কেহই কখন নয়নগোচর করেন নাই।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে খৃষ্টীয়ানগণের সহিত যুদ্ধে মুসলমানেরা সর্ব্বদাই এই অগ্ন্যস্ত্রের ব্যবহার করিত। বারুদ আবিষ্কৃত হওয়া অবধি এই অস্ত্রের আর ব্যবহার হয় নাই, এবং বোধ হয়, এক্ষণে তাহার রচনা ও প্রয়োগসম্বন্ধে কেহ কিছুই বলিতেও পারেন না।

আমাদিগের রামায়ণপ্রভৃতি কাব্যে পাঠ করা যায়, এক বীর অগ্নি-বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে শত্রুসেনামধ্যে ভীষণ অগ্নির সঞ্চার হইল; অমনি প্রতিপক্ষীয় এক বীর বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে অবিরামে জলবর্ষণ হইতে লাগিল। বরুণের প্রতিকারার্থে বায়ু-বাণ, সর্পবাণের প্রতিকারার্থে গরুড়বাণ ইত্যাদির ভূরি ভূরি উল্লেখ কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কবিকল্পনার অসাধ্য কিছুই নাই ভাবিয়া আমরা সে সকল বর্ণনায় একদিনের নিমিত্তেও আস্থা প্রদর্শন করি নাই। কিন্তু ইংরাজী গ্রন্থে এই অস্ত্রের বিবরণ পাঠ করিয়া এক্ষণে আমাদিগের চিত্তের ভাবান্তর হইয়াছে। কৃত্রিম অগ্নি-নিক্ষেপের কৌশল যদি বিরচিত হইতে পারে, তবে জল, বায়ু ইত্যাদি নিক্ষেপ করিবার কোন প্রকার যন্ত্র ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার বাধা কি? আমাদিগের কাব্যগ্রন্থে ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য আর একজাতীয় অস্ত্রের উল্লেখ আছে;—ঐ জাতীয় অস্ত্রকে দৈব অস্ত্র বলিত;—সে সকল দৈবাস্ত্রের প্রয়োগ ও প্রতিসংহারের মন্ত্র অর্থাৎ গুপ্ত প্রকরণ কোন কোন মহারথীর জ্ঞাতসার ছিল। দৈব অস্ত্র সকলের ঈদৃশ প্রভাব ছিল যে, কিছুতেই তাহার শক্তি প্রতিহত হইত না। মহাভারতগ্রন্থের নায়ক অর্জ্জুন অনেক দৈবাস্ত্র জানিতেন। মহাভারতে ঐ মহারথীর যে সকল যুদ্ধের বৃত্তান্ত আমরা পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে একটি যুদ্ধে তাঁহার ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও রণদক্ষতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত হইতে হয়। ঐ যুদ্ধ

উত্তর-গোগৃহের যুদ্ধ। আশ্রয়দাতা বিরাটের উপকারার্থে ঐ যুদ্ধে অর্জ্জুনকে কৌরবসেনার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-কর্ণ-রক্ষিত কুরুসৈন্য সহসা পরাভূত হইবার নহে। অর্জ্জুন দেখিলেন, একপক্ষে আশ্রয়দাতা বিরাটের উপকার করা কর্ত্তব্য; পক্ষান্তরে দুর্য্যোধন যদিও অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তথাচ জন্মসম্বন্ধ নিবন্ধন তাঁহাকে আত্মীয় জ্ঞান করা উচিত। অতএব পরের উপকারার্থে আত্মীয় হনন করা ধীমান্ অর্জ্জুনের প্রীতিকর হইল না। ঈদৃশ অবস্থায় তিনি দৈবাস্ত্রের বলে উভয় দিক্ রক্ষা করিলেন। অর্জ্জুন সম্মোহন নামে এক দৈব অস্ত্র জানিতেন, ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিবামাত্র কুরুসৈন্যের যে বীর যেখানে যে ভাবে ছিলেন, তিনি তদবস্থায় সেইখানেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে বিরাটের গোধন উদ্ধার হইল, অথচ যুদ্ধে রক্তপাত করিতে হইল না। আমরা ভীরুস্বভাব বাঙ্গালী জাতি, প্রাণিহত্যা না ঘটিয়া যুদ্ধ চলিতে পারে, এরূপ কোন কৌশল পাইলে আমরা অবশ্যই যোদ্ধা হইতে পারি। আমরা চিরকাল মসী-ব্যবসায়ী, রক্ত দেখিলেই আমাদিগের হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়।

চিরপ্রদীপ।

প্রাকৃতিক ক্রিয়ার দেশ কালের অবধি নাই,—এমন স্থান নাই, যেখানে প্রকৃতির ক্রিয়া দেখিতে না পাওয়া যায়। যেখানে মনুষ্যের গতি নাই, যে স্থানের কোন সমাচার অদ্যাবধি মনুষ্যলোকে আইসে নাই, যুক্তিদ্বারা জানা যাইতেছে প্রকৃতি সেখানেও স্থির নাই। উৎপত্তি ও বিনাশ, প্রকৃতির এই দুই ক্রিয়া বিশ্বরাজ্যের একপ্রান্ত হইতে

অপরপ্রান্ত অবধি অবিরামে সম্পাদিত হইতেছে, সুতরাং বিশ্বের শেষ-সীমা যখন জানা যায় না, তখন প্রাকৃতিক ক্রিয়ার শেষ স্থান কোথায়, তাহা কিরূপে নিরূপিত হইবে ! দেশের বিষয়ে যেরূপ, কালের বিষয়েও প্রাকৃতিক ক্রিয়া সেইরূপ সীমাশূন্য। উৎপত্তি ও বিনাশ, প্রকৃতির এই দুই ক্রিয়া কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং কখন্ বা সমাপ্তি লাভ করিবে, তাহা নিরূপণ করা দূরে থাকুক, চিন্তা করিতেই চিত্ত-প্রদীপ স্তিমিত হইয়া পড়ে। ঈদৃশ অসীমায়তন প্রকৃতির ক্রিয়াতে অসংখ্য আশ্চর্য্য ব্যাপারের সংঘটন হওয়া অসম্ভব নহে। প্রকৃতির কথা দূরে থাকুক, মনুষ্য প্রকৃতির করগঠিত ক্ষুদ্র কন্দুকমাত্র, মনুষ্য হইতেই যে কতপ্রকার আশ্চর্য্য বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহাই নিরূপণ করা যায় না। যে দেশের লোকেরা বিশেষ অভিজ্ঞ নহে, তাহারা বিদ্যুদ্‌বার্ত্তার বিবরণ শুনিলে হয় বিস্মিত হয়, না হয় বিশ্বাস করে না। তৈল, ঘৃতপ্রভৃতি স্নেহপদার্থ ব্যবহার না করিয়াও প্রদীপ প্রজ্বলিত করা যাইতে পারে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কেহ একথা বলিলে এদেশের লোকে তাহাকে বাতুল বোধ করিত, কিন্তু এক্ষণে গ্যাসের আলো দেখিয়া আর কাহারও তাহাতে অবিশ্বাস নাই। মনুষ্যের বুদ্ধি হইতে এক্ষণে যেরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপারসমূহ সমুদ্ভূত হইতেছে, পূর্ব্বকালেও এইরূপ অনেক হইয়াছিল। আমরা নিম্নে মনুষ্যকৃত একটি আশ্চর্য্য রচনার বিবরণ প্রকটিত করিতেছি, পাঠ করিয়া দেখিলে প্রাচীনকালীন মনুষ্য-গণের বুদ্ধিবিদ্যার প্রাথর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ইউরোপীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ আশ্চর্য্যপ্রকারের প্রদীপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, ঐ প্রদীপ মনুষ্যের বিনা রক্ষণেও চিরদিন জাজ্বল্যমান থাকিতে পারিত।

যাঁহারা এই প্রদীপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন ব্যক্তির নিকটে তাহার কৌশল ব্যক্ত করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের জীবনান্তের পর ঐ বিদ্যা বিলুপ্ত হইয়া যায় ;—অন্যান্য বিলুপ্ত বিষয়ের প্রবাদের ন্যায় কেবল তাহারও প্রবাদ প্রচলিত ছিল মাত্র। কিন্তু অনেকেই সে প্রবাদ অমূলক জ্ঞান করিতেন। পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জর্ম্যাণ রাজ্যে রোজিক্রুসিয়স নামে একব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হয়েন ; ঐ ব্যক্তি হইতে ইউরোপে এক অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়, তাঁহার মত ও বিশ্বাসের সবিস্তার বিবরণ আমরা স্থলান্তরে বিবৃত করিব। সম্প্রতি বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যেরা ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণের যে চিরপ্রদীপের কথা শ্রুত হওয়া যায়, তাঁহাদিগের গুরু সেই চিরপ্রদীপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকেও শিখাইয়া দেন নাই। কিন্তু সে কথায় কাহারও বিশ্বাস ছিল না, পরন্তু যে ঘটনার দ্বারা শিষ্যগণের বাক্য বিশ্বাস্য হইয়াছিল, তাহা আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

মৃত্যুর পরে ঐ জর্ম্যাণ পণ্ডিতকে যে স্থলে ভূমিসাৎ করা হয়, প্রয়োজনবশতঃ কোন ব্যক্তি ঐ স্থান খনন করিতে করিতে সহসা একটি দ্বার দেখিতে পাইল ; ঐ দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রাচীর ছিল। খনক ব্যক্তি গুপ্তধনের লোভে দ্বার খুলিবামাত্র সহসা উজ্জ্বল আলোক আভা তাহার নয়নগোচর হইল। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল; ভূমির অভ্যন্তরে একটি আগার, তাহার তলভাগ খিলান করা, ঐ খিলানের প্রান্তভাগে একটি কাষ্ঠের মেজ আছে, সেই মেজের উপরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং ঐ প্রদীপের সম্মুখে একটি নরপ্রতিমা উপবিষ্ট রহিয়াছে। প্রতিমাটি বাম করে ভর দিয়া বিনতভাবে অবস্থিত, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মাবৃত,

এবং দক্ষিণ করে একটি দণ্ড ধৃত রহিয়াছে । খনক ব্যক্তি খিলানে এক পদ অর্পণ করিবামাত্র, নরপ্রতিমা উঠিয়া সরলভাবে দণ্ডায়মান হইল, দ্বিতীয় পদার্পণমাত্রে ঐ কৃত্রিম মানব দক্ষিণ করের দণ্ড রোষের ভঙ্গিমায় ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিল, ঐ ব্যক্তি তথাচ সাহসে ভর করিয়া আর এক পদ অগ্রসর হইবামাত্র পুত্তলী করস্থ দণ্ডের আঘাতে প্রজ্বলিত প্রদীপটি নির্ব্বাপিত ও তাহার আধার বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিল ;—আগার নিবিড় অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল।

এই সংবাদ শুনিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা আলো জ্বালিয়া তথায় যাইয়া দেখিল যে, পুত্তলীটির শরীর ঘটীযন্ত্রের প্রকরণে পিত্তল-যোগে বিনির্ম্মিত,—এবং আগারের তলভাগের সহিত এরূপ কৌশলে সংযুক্ত আছে যে, ঐ তলভাগে পদার্পণ করিলেই যন্ত্রের গুণে পুত্তলী হইতে পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পুত্তলীর বিষয়ে এইরূপ অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু বিনষ্ট প্রদীপের আর পুনরুদ্ধার হইল না ;—তৎসম্বন্ধে অদ্যাবধি কেহই কিছু নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কহেন যে, মৃত্তিকায় প্রোথিত শব-শরীর হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, বিশুদ্ধ বাহ্য বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইবামাত্র ঐ বাষ্প প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তদ্দর্শনেই অশিক্ষিত লোকের মনে প্রদীপদর্শনের ভ্রম জন্মে, যেহেতু প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে তাহাদিগের সংস্কার আছে যে, প্রাচীনকালে যে সকল পণ্ডিতেরা চির-প্রদীপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সমাধিগহ্বরে ঐ প্রদীপ প্রজ্বলিত আছে। এতদ্ভিন্ন কার্য্যতঃ কখন যে তাদৃশ প্রদীপ বিরচিত হইয়াছিল, এ কথা আধুনিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু উপরিবর্ণিত বিবরণটি যদি সত্য হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, পুত্তলীর

সম্মুখে যে প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল, সেটি কি?—বাষ্পের দীপকলিকাকারে একমাত্র স্থানে প্রজ্বলিত থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে;—বাষ্প হইলে উহা আগারের সকল স্থানেই প্রজ্বলিত থাকিত। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ বায়ুর যোগে বাষ্প ক্ষণমাত্র প্রজ্বলিত হইয়াই পরক্ষণে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রদীপ অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ প্রজ্বলিত ছিল;—অবশেষে কেবল পুত্তলীর দণ্ডতাড়না-নিবন্ধন আধার ভগ্ন হওয়ায় বিনষ্ট হইয়া যায়। ঈদৃশ অবস্থায় বাষ্পমূলক মীমাংসা কিরূপে সন্তোষজনক হইতে পারে?—পণ্ডিতগণের মীমাংসা, অনেক বিষয়ে, বিবিধার্থসংগ্রহের "ভৌতবিচার" অভিধেয় কৌতুকাবহ মীমাংসায় সমাপ্তি লাভ করে*। কচিৎ কোন কোন

* "রাজদ্বারে এক হস্তী দেখিয়া কোন ন্যায়বিশারদ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে একি আশ্চর্য্য?" তাঁহার সমভিব্যাহারী বৃহৎকায় কৃষ্ণবর্ণ জীব ও তাহার শ্বেত দন্ত দেখিয়া কহিলেন, "বন্ধো! এটা অন্ধকার, মূলা ভক্ষণ করিতেছে"। প্রথম ব্যক্তি আপনার ন্যায়ব্যুৎপত্তিপ্রসাদে হস্তীর কর্ণ দেখিয়া অনায়াসে তর্ক করিলেন, "যদি তাহাই হইবে, তবে কুলা সঞ্চালন কেন করিতেছে?" তৎসহচর স্বীয় মীমাংসায় দোষারোপ দেখিয়া কহিলেন, "এ একটা মেঘ এবং তাহাতে বকপংক্তি উড়িতেছে"। ন্যায়বিশারদ কহিলেন, "সখে তাহাও নহে, কারণ মেঘের চারিটা শুম্ভ নাই"। সহবাসক্রমে সমভিব্যাহারী স্বীয় সখার ব্যুৎপত্তির ঘ্রাণ পাইয়াছিলেন, অতএব প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, "এটা কোন বান্ধব, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছে, 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ'।" প্রথম ব্যক্তি প্রখর চতুরতার বলে হস্তিশুণ্ড দেখিয়া বিতণ্ডা করিলেন, "যদি তাহাই হইবে, তবে লগুড় নাড়িবার প্রয়োজন কি? তবে এটা কোন বস্তুর ছায়া।" সখা শিরশ্চালনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর দিলেন, "তাহাও নহে, যেহেতু ছায়ার গর্জ্জন সম্ভবে না।" দ্বিতীয় ব্যক্তি ইহাতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া মীমাংসা করিলেন যে, "তবে এটা কিছুই নহে।"—এবং ঐ মীমাংসায় উভয়ে সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"—বিবিধার্থসংগ্রহ।

চিরদিন কিরূপে প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকিতে পারে, তাহার নানা উপায় ভাবিয়া দেখিয়া যুক্তিসঙ্গত কোন প্রকরণ বোধায়ত্ত হইল না, সুতরাং ইউরোপীয় আধুনিক পণ্ডিতেরা মীমাংসা করিলেন যে, চিরপ্রদীপ অলীক কথামাত্র। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।"

পণ্ডিত চিরপ্রদীপকে নিতান্ত অসাধ্য বস্তু জ্ঞান করেন না, কিন্তু বর্ত্তমান-কালে তাহা যে কেহ সিদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায় না।

সিসেরো নামে রোমনগরে একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার দুহিতার নাম তুলিয়া। শুনিতে পাওয়া যায়, তুলিয়ার কবর খনন কালে তন্মধ্যে একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ দৃষ্ট হইয়াছিল। ষষ্ঠ এডওয়ার্ড রাজার সময়ে ইংলণ্ডে কনষ্টান্‌সস্‌ নামক এক ব্যক্তির কবরস্থান খনিত হয়, তন্মধ্যেও একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল। সূর্য্যের কিরণ প্রবিষ্ট হইবামাত্র ঐ উভয় প্রদীপই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। ঐ উভয় ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হইতে কবর খননের সময় পর্য্যন্ত গণনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তুলিয়ার প্রদীপ ১৫৫০ বৎসর এবং কনষ্টান্‌সসের প্রদীপ ১২০০ বৎসর পর্য্যন্ত কবরমধ্যে প্রজ্বলিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সুবর্ণকে পারদের ন্যায় চিরতরল অবস্থায় পরিণত করিতে পারিলে তদ্দ্বারা চিরপ্রদীপ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অতি বুদ্ধিমান্‌ হইয়াও যে, এপর্য্যন্ত ঐ আশ্চর্য্য রচনার সঙ্কেত আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়।

আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী।

খৃষ্টীয় ১৭৯২ সালে ফরাসিরাজ্যে একবার রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটন হয় ;— সেরূপ ভয়ানক ব্যাপার আর কোন রাজ্যে কখন ঘটে নাই। ইতিবৃত্তে তাহার সবিস্তার বিবরণ পাঠ করিতে করিতে এক একবার হৃদয় চমকিত হইয়া উঠে। ক্রুদ্ধ প্রজাগণ বিপ্লবের প্রথম উদ্যমেই রাজা ও রাজ-

পরিজনগণের মস্তক ছেদন করে, পরে পৃথক্ পৃথক্ দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রাণ হননে প্রবৃত্ত হয়। সে সময়ে ফরাসিরাজ্যের ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত, সকল ব্যক্তিই যেন ক্ষিপ্ত বা ভূতগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল ;—বিদ্রোহ অপবাদে কোন্ সময়ে যে, কাহার প্রাণান্ত হইবে, তাহার নিরূপণ ছিল না ;—লোক সকল এরূপ নির্দ্দয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অঙ্গনাগণও করে কুঠার লইয়া প্রকাশ্য শ্মশানস্থলে নরনিকরের কণ্ঠকর্ত্তন করিয়া সে সময়ে আনন্দ অনুভব করিত। ঐ বিপ্লবে যে কত লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণান্ত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে ক্রমে ফরাসিরা এরূপ রাক্ষস-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা প্রকাশ্য বধস্থলীতে বসিয়া আত্মীয় বান্ধবগণের শিরশ্ছেদন দর্শন করিতে করিতে মহানন্দে সুরাপান ও অশ্লীল প্রণালীর নৃত্যগীত করিত। হত্যাকাণ্ডে তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র ভয় বা বেদনা ছিল না। ফরাসিরাজ্যে বহুবৎসর পর্য্যন্ত ঐ বিপ্লবানল প্রজ্বলিত ছিল ;—তাহার তেজ কখন কিঞ্চিৎ মন্দ কখন বা পুনর্ব্বার উগ্র হইয়া উঠিত। বিখ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফরাসি রাজ্যের একাধিপত্যে অধিষ্ঠিত হইলে পর ঐ অনল সম্যক্ রূপে নির্ব্বাপিত হয়। এস্থলে ইহাও ব্যক্ত করা আবশ্যক যে, বিপ্লব ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে ফরাসিগণের মধ্যে অনেকেই প্রগাঢ় নাস্তিক ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাঁহারা কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত,তাঁহাদিগের মধ্যেই নাস্তিকতা রোগের প্রথম সঞ্চার হয়, পরে সংক্রামক পীড়ার ন্যায় ক্রমে ক্রমে ঐ রোগ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই বিপ্লবসম্বন্ধে একটিআশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। যাঁহারা ঐ বিপ্লবের কোন সমাচার অবগত নহেন, তাঁহাদিগের বোধসুলভার্থে আবশ্যক বোধে উপরিভাগে তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত প্রকটিত করা হইল।

১৭৮৮ খৃঃ অব্দে এক দিবস কতকগুলি রাজসভাসদ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভোজনান্তে একত্র বসিয়া সুরা সেবন করিতে করিতে পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন ;—ঐ সভায় কতিপয় সদ্বংশজা সীমন্তিনীও উপস্থিত ছিলেন। সুরামত্ত সভ্যগণের আলাপন ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের অস্তিত্বখণ্ডন, ও তাঁহার উপাসনার অলীকত্ব প্রতিপাদনপক্ষে পরিচালিত হইতে লাগিল। একজন সভ্য বিখ্যাত নাস্তিক পণ্ডিত ভল্‌টেয়ারের গ্রন্থের মনোমত কোন অংশ আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ বা কালসহকারে জ্ঞানোন্নতি প্রভাবে ঈশ্বর ও স্বর্গ নরকের অলীকত্ব জনগণের বোধায়ত্ব হইয়াছে বলিয়া তদ্‌বিষয়ে পরমানন্দের সহিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। অপর কোন এক সভ্য পানপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "হে সভ্যগণ! আমি নিশ্চিত বলিতেছি ঈশ্বর নামধারী কেহই নাই।" আর একজন সভ্য হাস্য করিয়া কহিলেন "আমার একজন ভৃত্য অদ্য কহিতেছিল যে, আমি যদিও ক্ষুদ্রব্যক্তি, তথাচ মহদ্‌বংশীয় ব্যক্তিগণের ন্যায় আমারও ঈশ্বর উপাসনার প্রতি কিছুমাত্র আস্থা নাই।" অবশেষে সকলেই এই বিষয়ে একমত হইলেন যে, ফরাসি রাজ্যের সামাজিক ব্যবহার, শাসনপ্রণালী ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে অতি সত্বর একটি শুভাবহ পরিবর্ত্তন সমুপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ;—তদ্দ্বারা ঈশ্বর-উপাসনার ভ্রম নিরাকৃত এবং সর্ব্বত্র জ্ঞানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সভাস্থ সকলেই এই বিষয়ে নিজ নিজ অভিপ্রায় আগ্রহসহ ব্যক্ত করিতেছিলেন,—কেবল একজন সভ্য মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন ;—অন্যান্য সকলের ব্যগ্রতার আতিশয্য দেখিয়া তিনি এক একবার হাস্য করিতেছিলেন মাত্র। ঐ সভ্যের নাম কেজোটি ; তিনি ফরাসি দেশের

একজন গ্রন্থকার ছিলেন এবং তাঁহাকে সকলেই অব্যবস্থিতচিত্ত বলিয়া জানিত। সভ্যেরা কিঞ্চিৎ প্রশান্ত হইলে কেজোটি কহিলেন, "হে সভ্যগণ! তোমরা যাহার জন্ত আগ্রহবান্ হইয়াছ, দেশের সে শুভ পরিবর্ত্তন তোমাদিগের জীবদ্দশাতেই সমুপস্থিত হইবে,—হে সভ্যগণ! আমি কহিতেছি, তোমরা সকলেই ঐ পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।" সভ্যগণের মধ্যে একজন কহিলেন, "এ কথা আমিও বলিতে পারি; যখন ঐ পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ সমুদয় সমুপস্থিত হইয়াছে, তখন ঐ পরিবর্ত্তনও অতি সত্বর ঘটিবে, তাহাতে আর সংশয় কি?" কেজোটি কহিলেন, "এ কথা সত্য; কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তনের ফলাফলের বিষয় কিছু বলিতে পারেন?—ঐ পরিবর্ত্তনের সময়ে এই সকল সভ্যগণের মধ্যে কাহার অদৃষ্টে কিরূপ ঘটনা ঘটিবে, তাহা জানিতে পারিয়াছেন?" এই কথায় কণ্ডর্সেট নামে একজন সভ্য ব্যঙ্গভাবে হাস্য করিয়া কহিলেন, "কাহার সম্বন্ধে কিরূপ ঘটনা ঘটিবে, বোধ হয় তুমি তাহা জানিতে পারিয়াছ, অতএব তুমিই তদ্বিষয় ব্যক্ত কর, আমরা শ্রবণ করি।" কেজোটি কহিলেন, "হে কণ্ডর্সেট! তুমি ঐ পরিবর্ত্তন বা রাষ্ট্রবিপ্লবে কারারুদ্ধ হইবে, পরে ঘাতকের হস্তে প্রাণহননের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং বিষপান করিয়া আপনার জীবনান্ত করিবে। তোমাদিগের অভিলষিত পরিবর্ত্তনের সময়ে রাজ্যে এরূপ আনন্দের দিন উপস্থিত হইবে যে, লোক সকল এক ক্ষণের নিমিত্তও হলাহল হাতছাড়া করিবে না।" এতৎ শ্রবণে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। একজন সভ্য কহিলেন, "কেজোটি! আমাদিগের ঈপ্সিত পরিবর্ত্তনে জ্ঞান ও বিদ্যার আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে, তুমি তাহাতে কারাগার, ঘাতক ও বিষ,—এ সকলের ঘ্রাণ কিরূপে প্রাপ্ত হইলে?"

কেজোট কহিলেন, "তোমরা যে জ্ঞানের অনুরাগী, সেই জ্ঞান হইতেই বিষ, ঘাতক ও কারাগার সমুদ্ভুত হইবে।—সে সময়ে সকল ব্যক্তিই জ্ঞানের দোহাই দিয়া ফিরিবে, যে ব্যক্তি যে কিছু কার্য্য করিবে, সে তাহা জ্ঞান ও স্বাধীনতার নাম উল্লেখ করিয়া করিবে;—সর্ব্বত্র একমাত্র জ্ঞানের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে,—জ্ঞানের উপাসনার নিমিত্ত রাজ্যমধ্যে বেদী প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকে অন্যান্য উপাসনা স্থানের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।" চামফোর্ট নামে একজন সভ্য হাসিয়া কহিলেন, "কেজোট! জ্ঞানের উপাসনার্থে যে বেদী বিনির্ম্মিত হইবে, বোধ হয়, তুমি তাহার পৌরহিত্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে।" কেজোট কহিলেন, "আমার অদৃষ্টে তাদৃশ উচ্চ পদলাভের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু চামফোর্ট! তুমি সে সময়ে একজন বড় লোক হইবে; যেহেতু তুমি আত্মহত্যার মানসে ক্ষুরের দ্বারা শিরাচ্ছেদন করিয়াও কতিপয় মাস জীবিত থাকিবে।" সভ্যেরা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উচ্চনাদে হাসিয়া উঠিলেন। কেজোট কহিলেন, "হে ডিভিক্! তুমি বাতরোগের যাতনায় অধীর হইয়া একাদিক্রমে ছয়টি শিরা ছেদন করিয়া একদা যামিনীযোগে পরলোকে গমন করিবে। হে নিকোলি! —হে বেলি!—হে মেলস হার্ব! তোমরা তিন জনে ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিবে, হে রচেট! তোমাকেও ঐরূপে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" সভ্যেরা কহিলেন, "কেজোট! তুমি একে একে আমাদিগের সকলকেই যে নিহত করিলে!" কেজোট কহিলেন, "আমি নহে, যাহারা তোমাদিগকে নিহত করিবে, তাহারা সকলেই তোমাদিগের ন্যায় জ্ঞানানুরাগী পুরুষ,—তোমাদিগের ন্যায় তাহারাও জ্ঞান ও বিদ্যার নাম সর্ব্বদা উচ্চারণ করিবে।" চামফোর্ট কহিলেন, "ভাল কেজোট! কত দিনে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইবে, তাহা বলিতে পার?" কেজোট

কহিলেন, "ছয় বৎসরের মধ্যে আমার এই সকল উক্তি কার্য্যে পরিণত হইবে।" লাহার্প কহিলেন, "ইহা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু কেজোটি! এই পরিবর্ত্তনে আমার সম্বন্ধে কি ঘটিবে বলিতে পার?" কেজোটি কহিলেন, "তোমার সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবে;—তুমি এই সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিবে, এবং জীবনের শেষাবস্থায় ঈশ্বরের নিতান্ত ভক্ত ও পরম ধর্ম্মপরায়ণ হইবে।" এই উক্তি শুনিয়া সভ্যেরা হাসিয়া আগার বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন, যেহেতু তাঁহাদিগের সংস্কার অনুসারে একজন কৃতবিদ্য ভদ্রবংশজ ব্যক্তির ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! তদনন্তর ডসেচ ডি গ্রাণ্ট উপাধিধারিণী সম্ভ্রান্তবংশীয়া কোন মহিলা কহিলেন "আমরা স্ত্রীলোক, কিন্তু আমাদিগের প্রতি অদৃষ্ট অনুকূল বলিতে হইবে, যেহেতু আগামী রাষ্ট্রবিপ্লবে আমাদিগের সম্বন্ধে কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে না।" কেজোটি কহিলেন, "মান্যে! এরূপ মনে করিবেন না যে, স্ত্রীলোক বলিয়া আপনি অব্যাহতি পাইবেন। লোকেরা আপনার করদ্বয় বান্ধিয়া ঘাতকের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যাইবে।—অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা আপনার ন্যায় দুর্দ্দশায় নিপতিত হইবেন।—লোক সকল সে সময়ে আপনার অপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর মহিলাগণের জীবন হনন করিবে।" একজন সভ্য কহিলেন, "এতদপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর নারীর জীবন হনন হইবে, ইহা কিরূপ? ইঁহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর মহিলা কে?" কেজোটি উত্তর করিলেন, "রাজবংশীয়া কুমারীগণ, এবং তাঁহাদিগের অপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর নারী এই বিপ্লবে নিহত হইবেন।" সভ্যেরা এই কথা শ্রবণে বিষণ্ণ ও গম্ভীরভাবে পরস্পরের বদনাবলোকন করিতে লাগিলেন। সভ্যগণের ভাবের ঈদৃশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার প্রফুল্ল

করিবার মানসে পূর্ব্বোক্ত মহিলা পরিহাসের ভাবে কেজোটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, আমার প্রাণ ঘাতন হউক, কিন্তু বোধ হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে, পারত্রিক মঙ্গলার্থে ধর্ম্মযাজকের সাহায্য পাইতে পারির ?"* কেজোটি কহিলেন, "ভদ্রে! তাহা পাইবেন না। সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত এক ব্যক্তি মাত্র ঘাতকের করে নিহত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজকের সাহায্য পাইবেন, তৎপরে আর কেহই তাহা পাইবেন না।" তদনন্তর কেজোটি কিঞ্চিৎ বিচলিতচিত্ত হইয়া কহিলেন, "সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ঐ ব্যক্তি কে, তাহা আপনারা কি শুনিতে ইচ্ছা করেন?—তিনি ফরাসি রাজ্যের রাজা।"

পরিহাসপরায়ণ সভ্যেরা ইতিপূর্ব্বেই বিষণ্ণভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে ভূপতির সম্বন্ধে কেজোটির এই উক্তি শুনিয়া তাঁহারা ত্রস্তভাবে সভা ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। কেজোটিও তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গমনোদ্যত হইলেন। এরূপ সময়ে পূর্ব্বোক্ত মহিলা তাঁহার করধারণ করিয়া কহিলেন, "তুমি আমাদিগের সকলেরই ভাবী অদৃষ্টের বিবরণ ব্যক্ত করিলে, কিন্তু তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলিলে না।" এতৎ শ্রবণে কেজোটির নয়নযুগল জলপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "মান্যে! রোমানেরা যে যেরুজুলাম নগর আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার ইতিবৃত্ত আপনি পাঠ করিয়াছেন?" মান্যা মহিলা কহিলেন, "জোসে-ফিন-প্রণীত তাহার ইতিবৃত্ত আমি পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তুমি মনে কর যেন আমি পাঠ করি নাই।" কেজোটি কহিলেন, "রোমানেরা জেরুজুলাম

---

* কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে তাহাকে পারলৌকিক বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত একজন ধর্ম্মযাজককে তৎসমীপে প্রেরণ করা হয়, খৃষ্টিয়ান রাজ্যে এইরূপ নিয়ম আছে।

নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া যে সময়ে নগর পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে এক ব্যক্তি—'হায়! জেরুজেলাম কি হতভাগ্য! হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট!'—এই উক্তি করিতে করিতে অবিরামে সাত দিন সাত রাত্রি নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল;—অবশেষে রোমানগণের যন্ত্রনিক্ষিপ্ত একখণ্ড পাষাণাঘাতে ঐ ব্যক্তি গতজীবিত হইয়া নিপতিত হইয়াছিল।" এইমাত্র কহিযা কেজোটি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কেজোটির ১৭৮৮খৃঃ অব্দের এই সমুদয় উক্তি ১৭৯২।৯৩।৯৪ খৃঃ অব্দে অবিকল কার্য্যতঃ সম্পন্ন হইযাছিল। যাঁহার যেরূপে প্রাণান্ত হওয়ার বিষয় কেজোটি কহিয়াছিলেন, তাঁহার সেইরূপেই প্রাণান্ত হইয়াছিল। এমন কি, কেজোটির উক্তি অনুসারে বিপ্লবসময়ে ফরাসি-রাজ্যে জ্ঞান-দেবতার উপাসনার্থে সত্যই একটি বেদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, লোক সকল গীতবাদ্য করিতে করিতে তথায় যাইয়া তাঁহার উপাসনা করিত, গির্জা প্রভৃতি আর সকল উপাসনার স্থানের দ্বার সে সময়ে রুদ্ধ হইয়াছিল। সভ্যগণের মধ্যে কেবল লাহার্পীর জীবনান্ত হয় নাই; যে সকল লোক মুখে মুখে জ্ঞান, বিদ্যা ও স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন, ফরাসি-বিপ্লবে তাঁহাদিগের জঘন্য আচরণ দর্শনে লাহার্পীর অন্তরের ভাব পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তিনি পূর্ব্বের নাস্তিকতা পরিহারপূর্ব্বক জীবনের শেষভাগে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছিলেন। কেজোটিও তাঁহার ঐ ভাবী পরিবর্ত্তনের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ফরাসি-বিপ্লবের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ওয়াল্টর স্কট্ কৃত নেপোলিয়নের জীবনবৃত্তান্তগ্রন্থের অবতরণিকাভাগ অথবা "থিয়ার্স ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন" পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

যে সকল ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী, শকুন ও গ্রহজন্য শুভাশুভে বিশ্বাস করেন, ইউরোপীয় আধুনিক খৃষ্টীয়ান সভ্যেরা তাঁহাদিগকে মূর্খ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, তাঁহাদিগের দেশেও ভবিষ্যদ্বাণী ও শকুন ইত্যাদির অভাব নাই। তৎসংক্রান্ত যে সমস্ত বিবরণ আমরা আহরণ করিয়াছি, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয় প্রকাশ করিব। কেজোটের ভবিষ্যদ্বাণীসম্বন্ধে স্মরণ করা উচিত যে, কেজোটি একজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ছিলেন মাত্র। অলৌকিক ক্ষমতার ভাণ অথবা ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান তিনি আর কখন প্রদর্শন করেন নাই, কিরূপে তাঁহার অন্তরে সহসা ঈদৃশ দৈবশক্তির আবির্ভাব হইল, তাহা বোধগম্য হয় না।

আশ্চর্য্য ব্যাধি।

"শরীরং ব্যাধিমন্দিরং"—এই প্রাচীন বাক্য কেবল মনুষ্যের শরীরসম্বন্ধেই সত্য; ইতর প্রাণীর শরীরসম্বন্ধে নহে, যেহেতু ইতর প্রাণীর ব্যাধি নাই। অশ্ব, গো, হস্তী প্রভৃতি যে সকল ইতর জীবকে মনুষ্য আবদ্ধ করিয়া পালন করেন, তাহারাই সময়ে সময়ে পীড়াক্রান্ত হয়। যাহারা স্বাধীন-স্বভাবে বিচরণ করে, তাহাদিগের কিরূপে পীড়া সম্ভব হইতে পারে?—যেহেতু স্বভাবের অত্যাচরণই রোগের একমাত্র কারণ। যথেচ্ছা আহার ও স্বচ্ছন্দ-বিহার সুস্থাবস্থার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়; পালিত পশুরা তদুভয়েই বঞ্চিত; সুতরাং মনুষ্যের অস্বাভাবিক পালননিবন্ধনই তাহাদিগকে পীড়াক্রান্ত হইতে হয়। স্থল, জল ও বিয়দ্বিহারী ইতর প্রাণিগণ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে আহার

করে, আনন্দ প্রকাশ করে, নিদ্রাসুখ অনুভব করে, এইরূপে কালাতিপাত করিতে করিতে, হয় অপেক্ষাকৃত বলবান্ জীবকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, অথবা ঝটিকা প্রভৃতি দৈববিভ্রাটে অবসন্ন হইয়া, কিম্বা কালে ক্ষীণসত্ব হইয়া চরম শান্তি মরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে;—তাহাদিগকে চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না; কটু তিক্ত কষায় রসের ভৈষজও সেবন করিতে হয় না। কিন্তু জীবরাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ মনুষ্যজাতিকে নিরন্তর ব্যাধির যন্ত্রণায় বিব্রত হইতে হয়। মনুষ্য আহারনিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক সকল কার্য্যেই স্বভাবের অন্যথাচরণ করেন, তদ্ভিন্ন বিষয়-প্রলোভন-নিবন্ধন নিষ্ফল হিংসা, দ্বেষ ও শোকসন্তাপে দিন দিন তাঁহার জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে;—ঈদৃশ প্রাণীর ভাগ্যে স্বাস্থ্যসুখের উপভোগ কিরূপে সম্ভবিত হইতে পারে? মনুষ্য যত প্রকারে স্বভাবের প্রতিকূল আচরণ করেন, তাহা সমুদয় আনুপূর্ব্বিক ভাবিয়া দেখিলে এক দিনের স্বাস্থ্য ও পঞ্চত্রিংশতি বর্ষ পরমায়ুও তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের পরম কৃপা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনুষ্য ভিন্ন সৃষ্টির অন্য সকলেই স্বভাবের বশম্বদ;—স্বভাবের প্রতিকূল আচরণ করিবার ক্ষমতা আর কাহারই নাই। নরজাতি স্বভাবের অন্যথাচরণ করিতে সক্ষম, কিন্তু তন্নিবন্ধন দণ্ড পরিহার করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। চা, কাফী প্রভৃতি নিদ্রাহর দ্রব্য সেবন করিয়া মনুষ্য যামিনী-জাগরণ করিতে পারেন;—আর কোন জীব এরূপে নিদ্রার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সেই অস্বাভাবিক ক্রিয়াজন্য অবশেষে অবশ্যই তাঁহাকে রোগ ভোগ করিতে হয়। সমাজবদ্ধ হইয়াই নরজাতিকে এরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহারপরায়ণ হইতে হইয়াছে।—একজনের প্রতি বহুজনের ভরণপোষণের ভার, ব্যক্তিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি

কতকগুলি কাল্পনিক প্রলোভন, কতকগুলি অনর্থক আচারব্যবহারের অধীনত্ব, সমাজের এই সকল বিষয়ে জড়ীভূত হইয়াই মনুষ্য স্বভাবের সমুদয় নিয়ম বিস্মৃত হইয়াছেন ;—সুতরাং তাঁহার যন্ত্রণার আর অবধি নাই। সৃষ্টির আর সকল প্রাণীই প্রকৃতি জননীর ক্রোড়ে বসিয়া পরমানন্দে পানভোজন করিয়া কালাতিপাত করিতেছে, কেবল একমাত্র মনুষ্যই নিজ বুদ্ধিরূপিণী সীমন্তিনীর কুমন্ত্রণায় সমাজকুহকে নিবদ্ধ হইয়া হাহাকার করিয়া কাল কাটাইতেছেন ! এমন যে জীবনজ্যোতি, যাহার রক্ষাবিধানে জীবমাত্রেই যত্নবান, সমাজপ্রণালীর দোষে কোন কোন ব্যক্তিকে চেষ্টার দ্বারা সে দুর্লভ জ্যোতিরও নির্ব্বাণ সাধন করিতে হয় ;—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? সমাজের নিয়ম হইতে মনুষ্যের যে কত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সমুদয় বিবৃত করিতে হইলে একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিতে হয়, সুতরাং এ স্থলে তাহার যথোচিত সমালোচনা করা হইল না। প্রস্তাবানুরোধে কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, সমাজবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নরজাতি যখন অন্যান্য প্রাণিগণের ন্যায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেন, তখন তাঁহাদিগের শারীরিক অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। যেহেতু দেখা যাইতেছে, যে দেশের লোকেরা অপেক্ষাকৃত অসভ্য, যাহাদিগের মধ্যে চিকিৎসাব্যবসায়ী নাই, তাহারাই অপেক্ষাকৃত অরোগী ও দীর্ঘজীবী। যে দেশের লোকেরা অতি সভ্য, যাহাদিগের মধ্যে বহু চিকিৎসক, সেই দেশেই,—সেই সকল লোকের মধ্যেই পীড়ার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্য সমাজে চিকিৎসাশাস্ত্রের যত উন্নতি হইতেছে, যতই নব নব ঔষধের আবিষ্কার হইতেছে, ততই নব নব রূপ ধারণ করিয়া নিদারুণ ব্যাধি নরগণকে বিমর্দ্দন করিতেছে। জ্বর, উদরাময়

বাত, ব্রণ ইত্যাদি কতকগুলি ব্যাধি সকল দেশের লোকেরই জ্ঞাতসার আছে, কিন্তু নিম্নে আমরা যে একটি ব্যাধির বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম, কোন দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রেই তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ তাহার লক্ষণ ও প্রকৃতি নিতান্ত অবোধগম্য ও অতীব আশ্চর্য্য।

পঞ্জাব প্রদেশে কোন কোন ব্যক্তির এক প্রকার আময় জন্মে;—তাহার নাম "মার-আসক"। "মার-আসক" পারস্যভাষার শব্দ;—ইহার অর্থ "সর্পপ্রেম"। এই ব্যাধির এরূপ নামকরণের হেতু নিম্নে বিবৃত হইতেছে। এই পীড়ার প্রথম উপক্রমে রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও শরীর একান্ত বলহীন হয়; সুখে নিদ্রা হয় না এবং সর্ব্বপ্রকার উদ্যম ও চেষ্টা বিনষ্ট হইয়া যায়। সহস্র ঔষধ সেবন করিলেও এ সকল গ্লানির প্রতীকার হয় না। এতদবস্থায় রোগীর অন্তরে সর্ব্বদাই সর্পের ধ্যান উঠিতে থাকে, এবং স্বতই তাহার এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, আমাকে সর্পে দংশন করুক;—সেই ইচ্ছানুসারে অনতিবিলম্বে আশীবিষ আপনিই আতুর-সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্পকে দেখিবামাত্র পীড়িত ব্যক্তি পরমানন্দে তদভিমুখে স্বীয় করপ্রসারণ করিয়া দেয় এবং সর্পও তৎক্ষণাৎ সেই হস্তে দংশন করিয়া স্থানান্তরে গমন করে। এইরূপে হলাহল দেহান্তর্গত হইলেই দেহে পুনর্ব্বার ক্ষুধা, বল ও উৎসাহের সঞ্চার হয়; এবং রোগমুক্ত ব্যক্তিও পূর্ব্ববৎ স্নানভোজন করিয়া জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই ব্যাধি নিঃশেষে নিরাকৃত হইবার নহে;—সর্পদংশনের দ্বারা কিছুদিন পর্য্যন্ত যাপ্য থাকে মাত্র। এক মাস অথবা দুই মাস অন্তে সেই ব্যক্তির শরীরে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববর্ণিত গ্লানি সমুদয় আবির্ভূত হয়, এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্তরূপে ধ্যানাকৃষ্ট ভুজঙ্গ আসিয়া দংশন করিলে তাহার ক্লেশ নিবারিত হইয়া থাকে। একবার এই পীড়ার সঞ্চার হইলে আমরণকাল

সময়ে সময়ে এইরূপে সর্প-দংশনের দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়,—তদ্ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর নাই। যাহারা দীর্ঘকাল এই রোগ ভোগ করেন, তাঁহাদিগের শ্বাস প্রশ্বাস, অবিকল সর্পের শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় শব্দায়মান হয়, এবং কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে ঐ শ্বাস প্রশ্বাসে তাহার অসুখ বোধ হইতে থাকে। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, পীড়িত ব্যক্তির কামনা অনুসারে যখন সর্প আসিয়া সমীপস্থ হয়, তখন বস্ত্রের দ্বারা ঐ সর্পের শিরোভাগ আবৃত করিয়া ধৃত করতঃ তাহার কলেবরে পীড়িত ব্যক্তি দংশন করিলে ঐ রোগ হইতে নিঃশেষে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। বস্ত্রের দ্বারা সর্পের মস্তক মণ্ডিত না করিয়া তাহাকে দংশন করিলে রোগীর সম্মুখের দুইটি দন্ত স্খলিত হইয়া যায়। প্রবাদ-উক্ত এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কেহ রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই।

মার-কাসক পীড়ার যে বিবরণ বিবৃত হইল, বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, তাহার আদ্যোপান্তই আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ। অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি যে সকল গ্লানি এই পীড়ার প্রথমে উপলব্ধি হয়, প্রায় সকল ব্যাধির উপক্রমেই ঐ সকল লক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু তদবস্থায় সর্পদংশনের অভিলাষ যে স্বতই রোগীর অন্তরে উদয় হয়, ইহাই বর্ণিত ব্যাধির প্রথম আশ্চর্য্য। অভিলাষ অনুসারে ভুজঙ্গ আসিয়া যে আতুরজনকে দংশন করে, ইহাও সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে;—ভূবিবর-বিহারী বিষধর, ব্যথিত ব্যক্তির মনের কামনা কিরূপে বিদিত হয়, এবং কি অনিবার্য্য কারণের বশম্বদ হইয়াই বা তাহাকে দংশন করে! এমন কি, দংশন করিবার লালসায় পীড়িত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্প নদীর জলেও অবতীর্ণ হয়, এরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। সর্পের

সহিত ঈদৃশ ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়াই এই রোগ "মার-আসক" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু যে হলাহল দেহান্তর্গত হইলে, হয় হস্তী প্রভৃতি অতি বলবান প্রাণীরও প্রাণান্ত হয়, সেই হলাহল ক্ষুদ্র নর-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার স্বাস্থ্যের বিধান করে, ইহাও পরমাশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। চিকিৎসকেরা স্থাবর জঙ্গম উভয় প্রকারের বিষ শোধন করিয়া অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে, অল্পমাত্রায় অতি সাবধানে রোগবিশেষে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু কখন কখন তাহাতেও অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্পদংশনের বিষ যে ভেষজের ন্যায় পীড়াহর হয়, এরূপ ব্যবস্থা কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে অথবা এরূপ ব্যবহার কোন দেশের চিকিৎসায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পীড়া হইতে নিঃশেষে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে ভুজঙ্গের মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাকে দংশন করিবার যে প্রবাদ পঞ্জাব প্রদেশে প্রচলিত আছে, ইহাও বোধাতীত ব্যবস্থা। যে সর্পের বিষ দেহে প্রবেশ করিলে কিছুদিনের নিমিত্ত ব্যাধি যাপ্য থাকে, সেই সর্পের দেহে দংশন করিলে পীড়িত ব্যক্তি নিঃশেষে আরোগ্য লাভ করিতে সক্ষম হইবেন, এরূপ বিশ্বাসের হেতু কি? এবং বস্ত্রের দ্বারা সর্পের মস্তক মণ্ডিত না করিয়া তাহাকে দংশন করিলে রোগীর দুইটি দশন বিগলিত হইবে, ইহারই বা কারণ কি? এই সকল অবোধগম্য হেতুনিবন্ধন মার-আসক যে একটি আশ্চর্য্য পীড়া, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে যে, অস্মদ্দেশীয় কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির বাচনিক আমরা শ্রুত আছি যে, সর্পে দংশন করিবা-মাত্র সাহসে ভর করিয়া সর্পকে ধৃত করতঃ তৎক্ষণাৎ সরোষে ও সবলে তাহার অঙ্গে দংশন করিলে সর্পদংশনের বিষ নিঃশেষে নিরাকৃত হয়।

প্রতি-দংশনের সময়ে ভুজঙ্গ যদি বারম্বার মনুষ্যকে দংশন করে, তাহাতেও সে মনুষ্যের কোন অনিষ্ট হয় না। এতৎ ব্যবস্থার ফলাফল কেহ কখন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। ফলতঃ ইহাতে উপকারের সম্ভাবনা থাকিলেও নিতান্ত প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি নির্ভীক পুরুষ ভিন্ন অন্যের পক্ষে সে উপকার লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

"ঢ্যামনা" নামে এক জাতি সর্প আছে। তাহাদিগের বিষ তীব্র প্রকৃতির নহে;—সে বিষে জীবের জীবনান্ত হয় না। কথিত আছে যে, ঐ জাতীয় সর্পে কোন ব্যক্তিকে দংশন করিলে পর কালক্রমে শরীর বিকৃত হইয়া মার-আসক রোগ উৎপন্ন হয়। মার-আসক রোগে তাহার জীবনান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু সর্পদংশন তাহার অব্যর্থ ঔষধি, এবং সে ঔষধি কামনামাত্রেই পীড়িত ব্যক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন। চিকিৎসকেরা অনুমান করেন যে, ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে এক প্রকার ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়, সেই ঘ্রাণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই সর্প তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকে।

আমাদিগের দেশে প্রবাদ আছে যে, সর্পের মধ্যে ঢ্যামনা সাপই পুং-জাতীয়, গোখুরা প্রভৃতি তীব্রগরলধারী আর সকল সর্পই স্ত্রীজাতীয়;—ঢ্যামনার সঙ্গমেই তাহাদিগের সন্তান উৎপত্তি হয়। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত পীড়ার বিবরণে উপলব্ধি হইতেছে যে, পুংজাতীয় সর্পের বিষের বিকার স্ত্রীজাতীয় সর্পের বিষের দ্বারা উপশমিত হয়। এই মীমাংসার পোষকতায় একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাক্য আমরা পাঠকগণের স্মৃতিগোচর করিয়া দিতেছি,—"বিষস্য বিষমৌষধং"।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।